আনন্দবর্দ্ধন প্রণীত

# ধ্বন্যালোক

বঙ্গানুবাদ


অনুবাদক ঃ

শ্রীসুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত এম. এ., পি-এইচ. ডি.

ও

শ্রীকালীপদ ভট্টাচার্য্য কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ, এম. এ.


এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড

প্রকাশক :
নিভা মুখোপাধ্যায়
ম্যানেজিং ডাইরেক্টর,
এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ
২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

তৃতীয় সংস্করণ, আষাঢ়, ১৩৬৪

শ্রীহিমাংশু দে
দে'জ, আর্ট প্রেস
৭বি হলধর বর্ধন লেন
কলিকাতা-১২

# নিবেদন

বিদ্যোৎসাহী প্রকাশক শ্রীযুক্ত অমিয়রঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের আনুকূল্যে ধ্বন্যালোক ও লোচন-টীকার অনুবাদ প্রকাশ করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম। সেই সঙ্গে বাংলা অক্ষরে মূল গ্রন্থদ্বয়ও মুদ্রিত হইয়াছিল। আজকাল বাঙ্গালী পাঠকসম্প্রদায়ের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। তবে সকলের পক্ষে মূল সংস্কৃতগ্রন্থ অপরিহার্য্য নয় এবং অভিনব গুপ্ত যে সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ ও বিচার করিয়াছেন তাহাও প্রথম ব্রতী অনায়াসে বর্জ্জন করিতে পারেন। সেইজন্য শুধু ধ্বন্যালোক গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করা হইল। ইহাতে পাঠকবর্গের উপকার হইলে অনুবাদকদ্বয়ের পরিশ্রম ও প্রকাশকের উদ্যম সার্থক হইবে। ইতি

প্রেসিডেন্সি কলেজ<br>কলিকাতা<br>ফাল্গুন, ১৩৬৪

বিনীত<br>**শ্রীসুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত**

শ্রীমদানন্দবর্দ্ধনাচার্য্যপ্রণীত

# ধ্বন্যালোক

## শ্রীমৎ আচার্য্য অভিনবগুপ্তবিরচিত লোচননামা ব্যাখ্যাসমন্বিত। প্রথম উদ্দ্যোত।

মধুরিপু স্বেচ্ছায় সিংহমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিলেন। তাঁহার যে নির্ম্মল শোভাময় নখসমূহের দ্বারা চন্দ্রের রূপ বিনিন্দিত হইয়াছে ও যাহারা শরণাগতের দুঃখহরণকারী সেই নখসমূহ তোমাদিগকে ত্রাণ করুক।

**কাব্যের আত্মা ধ্বনি ইহা পণ্ডিতেরা পূর্ব্বে বলিয়াছেন। অপরে তাহার অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়াছেন। অন্যে তাহাকে ভাক্ত বা লাক্ষণিক অর্থ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন।**

**কেহ কেহ বলিয়াছেন তাহার তত্ত্ব অনির্ব্বচনীয়। তাই সহৃদয়ব্যক্তির মনঃপ্রীতির জন্য আমরা তাহার স্বরূপ বলিতেছি ॥ ১ ॥**

বুধ বা পণ্ডিত বলিতে কাব্যতত্ত্বজ্ঞদিগকে বুঝাইতেছে। কাব্যের আত্মা ধ্বনি—তাঁহাদের দ্বারা এইরূপ সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে। পরম্পরাক্রমে যাহা পূর্ব্বে সম্যক্‌ভাবে স্নাত অর্থাৎ প্রকটিত হইয়াছে তাহা সহৃদয়ব্যক্তির মনের কাছে প্রকাশিত হইতে থাকিলেও সেই অনস্তিত্ববাদীদের এই সকল প্রকারভেদ থাকা সম্ভব। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ হয়ত বলিবেন, "কাব্যের তো শব্দার্থময় শরীর। তাহার শব্দগত চারুত্বের হেতু হইতেছে অনুপ্রাসাদি শব্দালঙ্কার—ইহা তো প্রসিদ্ধই। অর্থগত চারুত্বের হেতু হইতেছে উপমাদি অর্থালঙ্কার, মাধুর্য্যাদি যে সকল গুণ বর্ণ ও সংঘটনাকে আশ্রয় করে তাহারাও প্রতীত হইয়া থাকে। উপনাগরিকাদি যে সকল

বৃত্তি কেহ কেহ প্রকাশ করিয়াছেন তাহারাও ইহাদিগের হইতে অতিরিক্ত কিছু নহে এবং তাহারাও শ্রবণগোচর হইয়াছে। বৈদর্ভী প্রভৃতিও তদনতিরিক্ত এবং তাহাদের কথাও শোনা গিয়াছে। এই সকলের ব্যতিরিক্ত এই ধ্বনি আবার কি? অন্য কেহ কেহ হয়ত বলেন, "ধ্বনি নামক কোন বস্তু নিশ্চয়ই নাই। কারণ কাব্যের যে সকল প্রস্থান পরম্পরাক্রমে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে তাহা হইতে বিভিন্ন যদি কোন কাব্য প্রকার থাকে তাহার মধ্যে কাব্যত্ব থাকিতে পারে না। যে শব্দার্থময়ত্ব সহৃদয় ব্যক্তির হৃদয় আহ্লাদিত করে তাহাই কাব্যত্বের লক্ষণ। ঐ সকল প্রসিদ্ধ প্রস্থান ব্যতিরিক্ত অন্য কোন মার্গের পক্ষে তাহা সম্ভব নহে। ধ্বনির নিয়মে অভিজ্ঞ কোন কোন সহৃদয় ব্যক্তিকে পরিকল্পনা করিয়া তাহার প্রসিদ্ধি হেতু ধ্বনিতে কাব্যত্ব আরোপ করিলেও তাহা সকল বিদ্বান্ লোকের মনঃপূত হইবে না।

আবার কেহ কেহ ধ্বনির অনস্তিত্বের কথা অন্যভাবে বলিতে পারেন, "ধ্বনি নামক অপূর্ব্ব বস্তুর কোন সম্ভাবনাই তো নাই। যেহেতু ইহা কমনীয়তাকে অতিক্রম করিয়া চলে না তাই ইহা কথিত চারুত্ব-হেতুগুলিরই অন্তর্গত। তাহাদের কোন একটির নূতন নামমাত্র করিতে গেলে যেটুকু বলা হইয়া থাকিতে পারে তাহা যৎকিঞ্চিৎমাত্র। অপিচ যেহেতু বক্তব্যের বৈচিত্র্য অনন্ত তাই ইহা সম্ভব যে প্রসিদ্ধ কাব্যসৌন্দর্য্যবিধায়ীরা ইহার কোন একটি সামান্য প্রকার দেখাইয়া যান নাই।' সেই অতি সূক্ষ্মপ্রকারলেশকে "ধ্বনি, ধ্বনি" বলিয়া কেহ কেহ এইরূপ অলীক ধারণা পোষণ করিতে পারেন যে তাঁহারা সহৃদয়ত্ব লাভ করিয়াছেন এবং সেই আনন্দে চক্ষু বুজিয়া নৃত্য করিতে পারেন। অন্যান্য মহাত্মারা অলঙ্কার-প্রভেদ সহস্র প্রকারে প্রকাশ করিয়াছেন ও করিতেছেন। তাই ধ্বনি প্রবাদ মাত্র। ইহার সূক্ষ্মবিচারযোগ্য কোন তত্ত্ব প্রকাশ করিতে পারা যায় না। তাই জনৈক কবি শ্লোক রচনা করিয়াছেন :—

যেখানে অলঙ্কারযুক্ত বা মনঃপ্রহ্লাদী কোন বস্তু নাই, যাহা নৈপুণ্যময় বাক্যের দ্বারা রচিত হয় নাই, যাহা বক্রোক্তিশূন্যও বটে—মূর্খ সেই কাব্যকেই ধ্বনিসমন্বিত বলিয়া প্রশংসা করিয়া থাকে। মতিমান্ ব্যক্তি যদি ধ্বনির স্বরূপ সম্পর্কে তাহাকে প্রশ্ন করে, তবে সে কি বলে তাহা আমরা জানিনা।

অন্যে ইহাকে শব্দের ভাক্ত (লাক্ষণিক) অর্থ বলিয়া উল্লেখ করেন। এই ধ্বনিসংজ্ঞিত কাব্যাত্মা শব্দের গৌণীবৃত্তি—অন্যে কেহ কেহ এইরূপ বলিয়া থাকেন। যদিও ধ্বনি শব্দের দ্বারা কাব্যলক্ষণকারীরা শব্দের গৌণীবৃত্তি বা অন্য কোন প্রকারের কথা প্রকাশ করেন নাই তথাপি যিনি কাব্যে শব্দের গৌণীবৃত্তির ব্যবহার দেখাইয়াছেন তিনি ধ্বনিমার্গ কিঞ্চিৎমাত্র স্পর্শ করিয়াছেন, কিন্তু সম্যক্ভাবে তাহার লক্ষণ করেন নাই। ইহা পরিকল্পনা করিয়াই বলা হইয়াছে, অন্যে ইহাকে ভাক্ত বা গৌণীবৃত্তি বলিয়া উল্লেখ করেন।

আবার কোন কোন লক্ষণ-করণ-কুশলী-বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিরা বলিয়াছেন যে ধ্বনির তত্ত্ব অনির্ব্বচনীয়, তাহা শুধু সহৃদয়হৃদয়-সংবেদ্য। অতএব এই সকল নানা বিরুদ্ধ মত আছে বলিয়া সহৃদয় ব্যক্তির মনোরঞ্জনের জন্য আমরা তাহার স্বরূপ বলিতেছি। সেই ধ্বনির স্বরূপ সকল সৎকবির কাব্যের প্রাণস্বরূপ এবং অতি রমণীয়। যে সকল প্রাচীন কাব্যলক্ষণ-বিধায়ীদের বুদ্ধি সূক্ষ্ম তাঁহাদের বুদ্ধিও ইহার রহস্য উন্মীলন করিতে পারে নাই। রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতি সমস্ত লক্ষণীয় কাব্যে ইহার সুপরিচিত ব্যবহার সহৃদয় ব্যক্তিরা দেখিয়া থাকিবেন। তাঁহাদের মনে আনন্দ প্রতিষ্ঠা লাভ করুক—এই উদ্দেশ্যে ইহা প্রকাশিত হইতেছে।

সেই বিষয়ে আবার ধ্বনিরই লক্ষণ করিতে আরম্ভ করিয়া ভূমিকা রচনা করিবার উদ্দেশ্যে এইরূপ বলা হইতেছে—

**সহৃদয় ব্যক্তি যে অর্থকে মানিয়া লয়েন এবং যাহা কাব্যের আত্মা**

**বলিয়া ব্যবস্থাপিত হইয়াছে তাহার দুইটি প্রভেদ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে—একটি বাচ্য অপরটি প্রতীয়মান ॥ ২ ॥**

কাব্যের শরীর গুণালঙ্কার প্রভৃতির জন্য লালিত্যময় এবং তাহার মধ্যে সমুচিত রসের সন্নিবেশ হইয়াছে। এই জন্যই ইহা সৌন্দর্য্যময়। ইহার সাররূপ যে অর্থ, যাহা সহৃদয় ব্যক্তির কাছে মর্য্যাদা পায় তাহার দুইটি প্রভেদ—বাচ্য ও প্রতীয়মান।

**তন্মধ্যে বাচ্য অর্থ প্রসিদ্ধ। অন্যান্য লেখকেরা উপমাদি নানা প্রকারের দ্বারা তাহার বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন।**

অন্যান্য লেখকেরা অর্থাৎ কাব্যের সৌন্দর্য্যবিধায়ীরা।

**তাই বিস্তারিত করিয়া এখানে তাহার কথা বলা হইল। ।৩॥**

কিন্তু প্রয়োজন মত কেবল তাহা উল্লেখ করা হইল।

**মহাকবিদের বাণীতে কিন্তু আর একটি বস্তু আছে যাহার নাম প্রতীয়মান অর্থ। তাহা রমণীর লাবণ্যের মত চিরপরিচিত অঙ্গসৌষ্ঠব হইতে পৃথকভাবে প্রতিভাত হইয়া থাকে। ৪ ॥**

আবার প্রতীয়মান নামে বাচ্য হইতে বিভিন্ন এক বস্তু মহাকবিদের বাণীতে রহিয়াছে। সেই যে বস্তু তাহা সহৃদয় ব্যক্তির কাছে সুপ্রসিদ্ধ। কিন্তু ইহা রমণীর লাবণ্যের মত সেই সকল অবয়ব হইতে পৃথক্‌ভাবে প্রকাশিত হয়। যেমন রমণীদিগের লাবণ্য সকল অবয়ব হইতে অতিরিক্ত অন্য কিছু; তাহাকে পৃথক্ করিয়া বর্ণনা করিতে হয় এবং তাহা অবয়বাতিরিক্ত তত্ত্ব হিসাবেই সহৃদয় ব্যক্তির নয়নের অমৃতস্বরূপ হইয়া প্রতিভাত হয়, সেই অর্থও সেইরূপ। পরে দেখান হইবে যে সেই অর্থের নানা প্রভেদ আছে; তাহা বাচ্য অর্থের সামর্থ্যের দ্বারা আক্ষিপ্ত বস্তুমাত্র অথবা অলঙ্কার অথবা রসাদি। সকল প্রকারের মধ্যেই তাহা বাচ্য অর্থ হইতে বিভিন্ন।

প্রথম প্রভেদ এই যে তাহা বাচ্য হইতে বহুদূরে অবস্থিত। কখনও কখনও দেখা যায় যে বাচ্যে বিধি থাকিলেও তাহা প্রতিষেধরূপে অভিব্যক্ত হয়। যথা—

"হে ধার্ম্মিক, তুমি নিশ্চিন্ত হইয়া ভ্রমণ কর। আজ সেই গোদাবরী-তীরস্থিত লতাকুঞ্জবাসী কুকুর সেই দৃপ্তসিংহের দ্বারা নিহত হইয়াছে।"

কখনও কখনও বাচ্যে প্রতিষেধ থাকিলে বিধিরূপ প্রতিভাত হয়। যেমন—

"এইখানে শাশুড়ী শয়ন করেন অথবা নিদ্রায় নিমগ্ন হয়েন; এইখানে আমি শয়ন করি। তুমি দিনের বেলায় ভাল করিয়া দেখিয়া রাখ। হে রাতকানা পথিক, তুমি আমাদের শয্যায় শয়ন করিও না।"

কখনও কখনও বাচ্যার্থে বিধি থাকিলে ব্যঙ্গ্য অর্থে কোনটাই প্রকাশিত হয় না। যেমন—

"তুমি চলিয়া যাও। আমার একার ভাগ্যেই দীর্ঘনিঃশ্বাস ও ক্রন্দন থাকুক। তোমারি দাক্ষিণ্য আজ নষ্ট হইয়াছে বলিয়া তাহার বিরহে তোমারও যেন এ দশা না ঘটে।"

কখনও কখনও বাচ্যার্থে প্রতিষেধ থাকিলে ব্যঙ্গ্য অর্থে বিধি বা নিষেধ কোনটিই থাকে না। যেমন—

"আমি প্রার্থনা করি তুমি প্রসন্ন হইয়া নিবৃত্ত হও; হে সুন্দরি, তোমার মুখচন্দ্রমার জ্যোৎস্নালোকে অন্ধকার বিদূরিত হইয়াছে। হে হতাশে, তুমি অন্য অভিসারিকাদের বিঘ্ন ঘটাইবে।"

কোথাও বা ব্যঙ্গ্য অর্থের বিষয় বাচ্য অর্থের বিষয় হইতে একেবারে বিভিন্ন হইয়া ব্যবস্থাপিত হয়। যেমন—

"স্ত্রীর অধর ব্রণযুক্ত দেখিলে কাহার বা ক্রোধ না হয়? ভ্রমরযুক্ত পদ্ম আঘ্রাণ করা তোমার স্বভাব। তাই বারণ করিলেও তুমি শোন নাই; এখন তাহার ফল ভোগ কর।

বাচ্য হইতে বিভিন্ন প্রতীয়মানের আরও অনেক প্রভেদ সম্ভব হইতে পারে। তাহাদের একটি দিক্‌মাত্র এখানে দেখান হইল। পরে সবিস্তারে দেখান হইবে যে দ্বিতীয় প্রভেদ (অলঙ্কার ধ্বনি) বাচ্য অর্থ হইতে পৃথক্। তৃতীয় যে প্রভেদ তাহা রসাদি লক্ষণাক্রান্ত এবং তাহা বাচ্য অর্থের সামর্থ্যের দ্বারা আক্ষিপ্ত হইয়াই প্রকাশিত হয়; কিন্তু তাহা সাক্ষাৎভাবে শব্দব্যাপারের বিষয় নহে। তাই তাহা বাচ্য হইতে বিভিন্নই বটে। তাহা হইলে দাঁড়াইল এই—তাহার (রসাদির) বাচ্যত্ব দুইভাবে হইতে পারে—তাহা শৃঙ্গারাদি স্বশব্দের দ্বারা নিবেদিত হইতে পারে অথবা বিভাবাদি প্রতিপাদনের দ্বারা প্রকাশিত হইতে পারে। প্রথম পক্ষ সত্য হইলে (অর্থাৎ শৃঙ্গারাদি স্বশব্দের দ্বারাই যদি ঐ ঐ রসের নিবেদন হয়) যেখানে এই সকল শৃঙ্গারাদি স্বশব্দের দ্বারা রস নিবেদিত হয় নাই সেইখানে রসের প্রতীতি না হওয়ারই প্রসঙ্গ আসিয়া পড়ে। কিন্তু সর্ব্বত্র রস এই সকল স্বশব্দের দ্বারা নিবেদিত হয় না। যেখানে তাহা হয় সেইখানেও বিশিষ্ট বিভাবাদির প্রতিপাদনের দ্বারাই রসসমূহের প্রতীতি হইয়া থাকে। শৃঙ্গারাদি শব্দের দ্বারা রসপ্রতীতি কেবল সমর্থিত হয়; ঐ সকল শব্দের দ্বারা উহা সৃষ্ট হয় না। কারণ বিষয়ান্তরে ঐ সকল শব্দের দ্বারা রসপ্রতীতি হয় এইরূপ দেখা যায় না যে কাব্যে কেবল শৃঙ্গারাদি শব্দের প্রয়োগ করা হইয়াছে অথচ বিভাবাদি প্রতিপন্ন হয় নাই সেইখানে রসের অস্তিত্ব একেবারেই দেখা যায় না। দ্বিতীয় কারণ এই যে শৃঙ্গারাদি স্বশব্দ না থাকিলেও কেবল বিশিষ্ট বিভাবাদি হইতেই রসের প্রতীতি হয়। কিন্তু শৃঙ্গারাদি শব্দ যাহারা নিজেরাই নিজেদের অভিধান তাহারাই রসের প্রতীতি আনয়ন করিতে পারে না। সুতরাং অন্বয়ী (positive) ও ব্যতিরেকী (negative) দৃষ্টান্তের দ্বারা প্রমাণিত হইল যে রসাদি অভিধেয়ের সামর্থ্যের দ্বারাই আক্ষিপ্ত হয়। তাহা একেবারেই অভিধেয় বা বাচ্য নহে। তাই

প্রমাণিত হইল যে তৃতীয় প্রভেদ ও বাচ্য হইতে বিভিন্ন। বাচ্যের সঙ্গে সঙ্গেই তাহার যে প্রতীতি হয় তাহা পরে দেখান হইবে।

**সেই অর্থই কাব্যের আত্মা। এই ভাবেই পুরাকালে আদি-কবির ক্রৌঞ্চমিথুনবিয়োগজনিত শোক শ্লোকত্ব বা কাব্যত্ব লাভ করিয়াছিল। ৫ ॥**

কাব্য নানাবিধ বিশিষ্ট বাচ্য বাচক রচনা সমূহের দ্বারা ঐশ্বর্য্যবান্; সেই প্রতীয়মান অর্থই তাহার সারভূত। নিহতসহচরীবিরহের জন্য কাতর হইয়া ক্রৌঞ্চ যে ক্রন্দন করিয়াছিল তাহা হইতে যে শোকের উৎপত্তি হইয়াছিল তাহা শ্লোকত্বে পরিণত হইল।

পূর্ব্বেই প্রতিপাদিত হইয়াছে যে শোক করুণরসের স্থায়ী ভাব এবং তাহা প্রতীয়মানরূপ অর্থাৎ বাচ্যাতিরিক্ত। প্রতীয়মানের অন্য প্রভেদ (বস্তু ও অলঙ্কার) দেখিলে দেখা যাইবে যে তাহাও রস ও ভাবের দ্বারাই উপলক্ষিত হয়, কারণ রসাদিরই প্রাধান্য থাকে।

**মহাকবিদের বাণী সেই মধুর অর্থবস্তু নিঃষ্যন্দিত করিয়া তাঁহাদের উজ্জ্বল অলোকসামান্য প্রতিভাবৈশিষ্ট্য অভিব্যক্ত করে। ৬ ॥**

বস্তুতত্ত্ব নিঃস্যন্দিত করিয়া মহাকবিদের বাণী তাহার অসামান্য প্রতিভাবৈশিষ্ট্য পরিস্ফুরিত করিয়া অভিব্যক্ত করে। এই জন্যই এই অতিবিচিত্র কবিপরম্পরাবাহী সংসারে কালিদাস প্রভৃতি দুই তিন বা পাঁচজন কবি মহাকবি বলিয়া পরিগণিত হয়েন।

প্রতীয়মান অর্থের অস্তিত্ব প্রতিপাদন সম্পর্কে অন্য প্রমাণ এই:—

**শুধু শব্দানুশাসন ও অর্থানুশাসনের—জ্ঞানের দ্বারা ইহা জানা যায় না। যাঁহারা কাব্যার্থতত্ত্ববিদ্ কেবল তাঁহারাই ইহা জানেন। ৭ ॥**

কেবল শব্দ ও অর্থের নিয়ম জানা হইলে সেই অর্থ জানা হয় না,

যেহেতু যাঁহারা কাব্যের অর্থতত্ত্ব জানেন ইহা শুধু তাঁহাদেরই জানা আছে। যদি এই অর্থ বাচ্যরূপ মাত্র হইত, তাহা হইলে বাচ্য ও বাচকের স্বরূপ জানা হইলেই ইহাও জানা হইত। বাস্তবিকপক্ষে যাঁহারা গান জানেন না কেবল গান্ধর্ব্ব লক্ষণ জানেন তাঁহারা যেমন স্বর শ্রুতি প্রভৃতির সঙ্গে পরিচিত হইতে পারেন না সেইরূপ যাঁহারা কেবল বাচ্য ও বাচক লইয়া পরিশ্রম করিয়াছেন কিন্তু কাব্যের অর্থতত্ত্ব বিষয়ে বিমুখ, এই অর্থ তাঁহাদের অগোচর। এই ভাবে বাচ্যাতিরিক্ত ব্যঙ্গ্যের অস্তিত্ব প্রতিপাদন করিয়া তাহারই যে প্রাধান্য হয় তাহা প্রমাণ করিতেছেন—

**সেই অর্থ এবং তাহাকে প্রকাশ করিতে পারে যে শব্দ—মহাকবি যত্নের সহিত সেই শব্দ ও অর্থকে প্রত্যাভিজ্ঞা সহযোগে বুঝিয়া লইবেন। ৮ ॥**

সেই ব্যঙ্গ্য অর্থ এবং তাহা প্রকাশ করিতে সমর্থ যে কোন শব্দ—সকল শব্দ নহে। সেই শব্দ ও সেই অর্থই মহাকবিকে প্রত্যভিজ্ঞার সহিত নিরূপণ করিতে হইবে। ব্যঙ্গ্য ও ব্যঞ্জকের সুপ্রয়োগ হইতেই মহাকবিদের মহাকবিত্ব লাভ হয়। শুধু বাচ্যবাচকসমন্বিত রচনার দ্বারা নহে।

ব্যঙ্গ্য ও ব্যঞ্জকের প্রাধান্য হইলেও কবিরা যে প্রথমে বাচ্য ও বাচককেই গ্রহণ করেন তাহা যুক্তিযুক্ত। তাই এখানে বলিতেছেন—

**আলোকার্থী যেমন আলোকলাভের উপায় হিসাবে দীপ-শিখায় যত্নবান হয়েন সেইরূপ ব্যঙ্গ্য অর্থকে আদর করিলেও সহৃদয় ব্যক্তি ব্যঙ্গ্য অর্থের উপায় হিসাবে বাচ্য অর্থে যত্নবান্ হয়েন। ৯ ॥**

যেমন আলোকার্থী হইয়াও মানুষ দীপশিখার জন্য যত্ন গ্রহণ করে, কারণ উহা আলোকলাভের উপায়—দীপশিখা ব্যতিরেকে তো আলোক পাওয়া সম্ভব হয় না—সেইরূপ যিনি ব্যঙ্গ্য অর্থের প্রত্যাদর করেন তিনিও

বাচ্য অর্থ সম্পর্কে যত্নবান্ হয়েন। ব্যঙ্গ্য অর্থের উদ্দেশ্য করিয়া প্রতিপাদক কবি কাব্যব্যাপারে প্রবৃত্ত হয়েন—তাহা এই ভাবে দেখান হইল।

প্রতিপত্তারও ব্যঙ্গ্য অর্থ সম্পর্কে এইরূপ ব্যাপার থাকে তাহা দেখাইবার জন্য বলিতেছেন—

**যেমন পদের অর্থের সাহায্যে বাক্যের অর্থের অবগতি হয় সেইরূপ ব্যঙ্গ্য অর্থের প্রতীতির পূর্ব্বে বাচ্য অর্থের প্রতীতি হয়। ১০ ॥**

যেমন পদের অর্থের সাহায্যে বাক্যের অর্থের অবগতি হয় সেইরূপ ব্যঙ্গ্য অর্থের প্রতীতির পূর্ব্বে বাচ্য অর্থের প্রতীতি হয়।

বাচ্য অর্থের পূর্ব্বে প্রতীতি হইলেও তাহার প্রতীতির জন্য ব্যঙ্গ্য অর্থের প্রাধান্য যাহাতে লুপ্ত না হয় তজ্জন্য দেখাইতেছেন—

**নিজের সামর্থ্যের দ্বারা বাক্যার্থ প্রকাশ করিলেও যেমন নিজের কার্য সম্পাদনে পদের অর্থ বিভক্ত হইয়া প্রকাশিত হয় না। ১১ ॥**

যেমন নিজের সামর্থ্যবশেই বাক্যার্থ প্রকাশ করিয়াও পদের অর্থ ব্যাপারনিষ্পত্তিতে বিভাবিত হয় না অর্থাৎ বিভিন্নরূপে কল্পিত হয় না।

**সেইরূপ যাঁহারা সচেতা, যাঁহাদের বুদ্ধিতে অর্থতত্ত্ব সহজে প্রতিভাসিত হয়, যাঁহারা বাচ্য অর্থের প্রতি বিমুখ, তাঁহাদের কাছে ব্যঙ্গ্য অর্থ সহজে প্রকাশিত হয়। ১২ ॥**

এইভাবে বাচ্যব্যতিরিক্ত ব্যঙ্গ্য অর্থের অস্তিত্ব ও প্রাধান্য প্রতিপন্ন করিবার পর বক্ষ্যমাণ প্রসঙ্গে ইহার উপযোগিতা বলিতেছেন—

**যেখানে অর্থ বা শব্দ নিজেকে অথবা অর্থকে গৌণ করিয়া সেই অর্থকে প্রকাশ করে সেই কাব্যবিশেষকেই পণ্ডিতেরা ধ্বনি আখ্যা দিয়াছেন। ১৩ ॥**

যেখানে অর্থ অর্থাৎ বিশেষ কোন বাচ্য অথবা শব্দ অর্থাৎ বিশেষ কোন বাচক সেই (প্রতীয়মান) অর্থকে প্রকাশ করে সেই কাব্যবিশেষের নাম ধ্বনি। ইহার দ্বারা দেখান হইল, বাচ্য ও বাচকের সৌন্দর্য্যের হেতু যে উপমাদি ও অনুপ্রাসাদি ধ্বনির বিষয় তাহা হইতে পৃথক্ ইহা দেখান হইয়াছে। "প্রসিদ্ধ প্রস্থানের অতিরিক্ত কোন মার্গে কাব্যত্ব থাকিতে পারে না"—ইহা যে বলা হইয়াছে তাহাও যুক্তিযুক্ত নহে। কারণ তাহা যে শুধু লক্ষণকারীদের কাছে প্রসিদ্ধ তাহা নহে, লক্ষ্য বস্তু পরীক্ষিত হইলে দেখা যাইবে যে তাহাই সহৃদয়ের হৃদয়াহ্লাদকারী কাব্যতত্ত্ব। ইহা ছাড়া আর যাহা রহিল তাহাকে চিত্র বলা হয়, ইহা পরে দেখাইব। আরও যে বলা হইয়াছে—যাহা কমনীয়তাকে অতিক্রম করে না তাহা অলঙ্কারাদির অন্তর্ভূত হইবে—তাহাও সমীচীন নহে; যে প্রস্থান শুধু বাচ্য ও বাচককে আশ্রয় করিয়াছে ব্যঙ্গ্য ও ব্যঞ্জকের সমাশ্রয়ী ধ্বনি কেমন করিয়া তাহার অন্তর্ভূত হইবে ?

বাচ্য ও বাচকের চারুত্বের হেতু তাহার (ধ্বনির) অঙ্গ, কারণ তাহা যে অঙ্গী ইহা প্রতিপাদিত হইবে।

এই বিষয়ের পরিকর শ্লোক—

যেহেতু ধ্বনি ব্যঙ্গ্য ও ব্যঞ্জকের সঙ্গে সম্পর্কিত সেইজন্য কেমন করিয়া তাহা বাচ্য ও বাচকের সৌন্দর্য্যের অন্তর্ভূত হইবে ?

প্রশ্ন হইতে পারে, যেখানে প্রতীয়মান অর্থ বিশদ্‌ভাবে প্রতীত হয় না তাহা ধ্বনির বিষয় না হইল। কিন্তু যেখানে প্রতীয়মানের সুস্পষ্ট প্রতীতি আছে—যেমন সমাসোক্তি, আক্ষেপ, অনুক্তনিমিত্তপ্রকারের বিশেষোক্তি, পর্য্যায়োক্তি, অপহ্নুতি, দীপক ও সঙ্কর অলঙ্কারাদিতে—সেইখানে ধ্বনি অলঙ্কারের অন্তর্ভূত হইবে এইরূপ বলা যাইতে পারে। এই যুক্তি খণ্ডন করিবার জন্য বলা হইয়াছে—'উপসর্জনীকৃত স্বার্থে\ৗ' (নিজেকে এবং অর্থকে গৌণ করিয়া) যেখানে অর্থ নিজেকে গৌণ করিয়া অথবা শব্দ

অভিধেয় অর্থকে গৌণ করিয়া অপর অর্থ প্রকাশ করে তাহাই ধ্বনি। ধ্বনি কেমন করিয়া গুণালঙ্কারের মধ্যে অন্তর্ভূত হইবে? ব্যঙ্গ্যপ্রাধান্যেই ধ্বনি। সমাসোক্তি প্রভৃতি অলঙ্কারে এই ব্যঙ্গ্যপ্রাধান্য নাই। সমাসোক্তির

চন্দ্র রাগযুক্ত হইয়া তারকাবিলোল রাত্রির মুখ বা সন্ধ্যাকে এমন ভাবে গ্রহণ করিল যে তাহার সম্মুখে যে অন্ধকারমিশ্রিত নীলবসন পতিত হইল, রাগাতিশয্যে তাহা চোখেই পড়িল না।

এই সকল দৃষ্টান্তে ব্যঙ্গ্য বাচ্যের অনুগামী; বাচ্যই প্রধানভাবে প্রতীত হয়। কারণ. যে নিশা ও শশীতে নায়কনায়িকার ব্যবহার আরোপিত হইতেছে তাহারাই বাক্যের অর্থভূত।

আক্ষেপ অলঙ্কারেও বাচ্য অর্থ ব্যঙ্গ্যবিশেষকে আক্ষেপ করিলেও বাচ্য অর্থেরই চারুত্ব হইয়া থাকে। আক্ষেপোক্তির বলেই বাক্যার্থের মধ্যে ঐ বাচ্য অর্থের চারুত্ব জ্ঞাত হইয়া থাকে। সেইখানে বিশেষ কোন কথা অভিহিত করিবার উদ্দেশ্যে যে নিষেধরূপ বাচ্যার্থ শব্দকে আশ্রয় করে তাহা ব্যঙ্গবিশেষকে আক্ষিপ্ত করিয়া মুখ্য কাব্যশরীর হইয়া দাঁড়ায়। কাব্যসৌন্দর্য্যের উৎকর্ষলাভের জন্যই বাচ্য ও ব্যঙ্গ্যের মধ্যে একটি প্রধান বলিয়া বিবক্ষিত হয়। যথা—

"সন্ধ্যা অনুরাগবতী, দিবসও তাহার সম্মুখে উপস্থিত। কিন্তু অহো, দৈবের কিরূপ গতি যে তবুও মিলন হইল না।"

এখানে ব্যঙ্গ্যের প্রতীতি থাকা সত্ত্বেও বাচ্যার্থের চারুত্বই উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে। তাই তাহারই প্রাধান্য বিবক্ষিত হইয়াছে।

আবার যেমন দীপক ও অপহ্নুতি অলঙ্কারের উপমা ব্যঙ্গ্য হইয়া প্রতীত হইলেও তাহা প্রধান বলিয়া বিবক্ষিত হয় না এবং তজ্জন্য তাহাদের উপমা বলিয়া নামকরণও হয় না, সেইরূপ এখানেও বুঝিতে হইবে। বিশেষোক্তি অলঙ্কারে নিমিত্ত বলা না হইলেও—যেমন,

"বন্ধুগণ কর্তৃক আহূত হইয়াও পথিক নিদ্রা ত্যাগ করিয়াও এবং যাইবার মনন করিয়াও 'আসিতেছি' এই বলিয়া আলস্য শিথিল করিতেছে না।"

এখানে প্রসঙ্গের বলে ব্যঙ্গ্যের শুধু প্রতীতি হইতেছে। তাহার প্রতীতির জন্য একটুও কাব্যসৌন্দর্য্য নিষ্পন্ন হইতেছে না: তজ্জন্য তাহার প্রাধান্য হইতেছে না। পর্য্যায়োক্ত অলঙ্কারেও যদি ব্যঙ্গ্য প্রধান বলিয়া বিবক্ষিত হয় তাহা হইলে তাহা ধ্বনির অন্তর্ভূত হউক, কিন্তু ধ্বনি তাহার অন্তর্ভূত হইবে না; যেহেতু পরে প্রতিপাদন করিবার ইচ্ছা আছে যে ধ্বনির বিষয় বহুবিস্তারিত, তাহা অঙ্গী। আবার ভামহ পর্য্যায়োক্ত অলঙ্কারের যে উদাহরণ দিয়াছেন সেই জাতীয় কাব্যে ব্যঙ্গ্যেরই প্রাধান্য নাই। কারণ সেই সকল স্থানে বাচ্য গৌণ হইয়া বিবক্ষিত হয় নাই। অপহ্নুতি ও দীপক অলঙ্কারেও যে বাচ্যের প্রাধান্য থাকে এবং ব্যঙ্গ্য তাহার অনুযায়ী হয় ইহা সুপ্রসিদ্ধই। সঙ্কর অলঙ্কারেও যেখানে একটি অলঙ্কার অন্য একটি অলঙ্কারের ছায়া গ্রহণ করে অর্থাৎ পোষকতা করে সেইখানেও ব্যঙ্গ্য প্রধানভাবে বিবক্ষিত হয় না বলিয়া তাহা ধ্বনির বিষয় হয় না। দুই অলঙ্কারের সমান সম্ভাবনা হইলে বাচ্য অর্থ ও ব্যঙ্গ্য অর্থের সমান প্রাধান্য হইয়া থাকে। আবার সেখানে বাচ্যকে গৌণ করিয়া যদি ব্যঙ্গ্য অবস্থান করে তাহা হইলে তাহাও ধ্বনির বিষয় হউক্। কিন্তু তাহাই যে একমাত্র ধ্বনি এমন কথা বলিতে পারা যায় না।

পর্য্যায়োক্ত অলঙ্কার সম্পর্কে যে যুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে এখানেও তাহাই প্রযোজ্য। অধিকন্তু সঙ্কর অলঙ্কারের সকল প্রভেদে সঙ্করোক্তিই ধ্বনির সম্ভাবনার নিরাকরণ করে। অপ্রস্তুতপ্রশংসা অলঙ্কারেও যেখানে বাচ্য অপ্রাসঙ্গিক ও প্রতীয়মান প্রাসঙ্গিকের মধ্যে সামান্যবিশেষ বা নিমিত্তনিমিত্তী ভাবযুক্ত সম্বন্ধ থাকে না সেইখানে বাচ্য ও প্রতীয়মানের

সমান প্রাধান্য থাকে। যেখানে অপ্রাসঙ্গিক সাধারণ উক্তি অভিহিত হইতে থাকে এবং তাহার সঙ্গে প্রাসঙ্গিক প্রতীয়মান বিশেষ উক্তির সম্বন্ধ থাকে সেইখানে বিশেষের প্রতীতি থাকিলেও সাধারণের সঙ্গে তাহার অবিনাভাবের (একাত্মতার) জন্য সাধারণ উক্তিরই প্রাধান্য হইয়া থাকে। আবার যখন বিশেষ উক্তি সাধারণ উক্তিতে পর্য্যবসিত হয় তখনও সাধারণ উক্তির প্রাধান্য হইলে বিশেষোক্তিরও প্রাধান্য থাকে, কারণ সাধারণ উক্তির মধ্যে সকল বিশেষ উক্তি অন্তর্ভূত হয়। যেখানে নিমিত্তনৈমিত্তিকভাব থাকে সেইখানেও এইরূপ যুক্তিই অনুসরণীয়। যখন অপ্রস্তুতপ্রশংসা অলঙ্কারে প্রস্তাবিত ও অপ্রস্তাবিতের মধ্যে শুধু সারূপ্যমূলক সম্বন্ধ থাকে তখনও প্রাসঙ্গিকের সঙ্গে সারূপ্যসম্বন্ধবিশিষ্ট অপ্রাসঙ্গিক অভিহিত হইলেও তাহা যদি প্রধান বলিয়া বিবক্ষিত না হয় তাহা হইলে তাহা ধ্বনিরই অন্তর্ভূত হইবে। নচেৎ অন্য কোন অলঙ্কার হইবে না। তাই এই সংক্ষিপ্তসার দেওয়া হইল।

যেখানে ব্যঙ্গ্য অর্থ শুধু বাচ্য অর্থের অনুযায়ী বলিয়া প্রাধান্য লাভ করে নাই সেইখানে সমাসোক্তি প্রভৃতি বাচ্যালঙ্কার স্ফুট হয়।

যেখানে ব্যঙ্গ্য অর্থ বাচ্য অর্থের সঙ্গে সমান প্রাধান্য লাভ করিয়া প্রতিভাত হইয়াছে কিন্তু প্রাধান্য লাভ করিতেছে না সেইখানে ধ্বনি নাই।

যেখানে শব্দ ও অর্থের তাৎপর্য্য ব্যঙ্গ্যকে লক্ষ্য করিয়াই ন্যস্ত থাকে এবং কোন এক অলঙ্কারের মিশ্রণ হয় না তাহাই ধ্বনির বিষয়।

সেইজন্য ধ্বনি অন্য কিছুর অন্তর্ভূত হয় না। ইহা যে অন্য কিছুর অন্তর্ভূত হয় না তাহার অপর কারণ এই যে কাব্যের যে বৈশিষ্ট্য ধ্বনি তাহাই অঙ্গী বলিয়া কথিত হয়। পরে দেখান হইবে তাহার অঙ্গ— অলঙ্কার, গুণ ও বৃত্তি। অবয়বগুলি পৃথক্‌ভাবে অবয়বী হইতে পারে না, ইহা তো প্রসিদ্ধই। ইহাদিগকে যদি অপৃথক্ করিয়া সমুদায় ভাবে লওয়া

যায় তাহা হইলেও ইহারা অবয়বীর অঙ্গই বটে। অবয়ব অবয়বী হইতে পারে না। যেখানে বা ইহারা একই বস্তু হয় সেইখানেও ইহা ( অবয়বী ) একেবারে তন্নিষ্ঠই ( অবয়বনিষ্ঠই ) নহে। সুধীরা বলিয়াছেন—পণ্ডিতগণই প্রথমে ইহার অস্তিত্বের কথা প্রচার করিয়াছেন। যেমন তেমন করিয়া ইহা প্রচারিত হয় নাই—ইহাই প্রতিপন্ন হইল। বিদ্বানদের মধ্যে প্রথমে নাম করিতে হইবে বৈয়াকরণদের। যেহেতু সকল বিদ্যার মূলে রহিয়াছে ব্যাকরণ। বৈয়াকরণরা শ্রূয়মাণ বর্ণে ধ্বনি শব্দের প্রয়োগ করেন। সেইরূপ তাঁহাদের মতানুযায়ী কাব্যতত্ত্বদর্শী অন্য পণ্ডিতগণ "বাচ্যবাচক-সংমিশ্রিত শব্দাত্মাই কাব্য" এই রূপে ধ্বনির নামকরণ কবিয়া ধ্বনি ব্যঞ্জকত্বেব সঙ্গে সমানধর্ম্মী এইরূপ বলিয়াছেন। এবংবিধ যে ধ্বনি তাহার প্রভেদ ও প্রভেদের ভেদ পরে বলা হইবে। ইহাদের সংকলনের দ্বারা যে মহাবিষয়ত্ব বা ব্যাপকতা প্রকাশ করা হইতেছে তাহা অপ্রসিদ্ধ অলঙ্কারবিশেষমাত্রেব প্রতিপাদনেব তুল্য নহে। সুতরাং ধ্বনিতে নিবিষ্টচিত্ত ব্যক্তিদের প্রযত্ন যুক্তিযুক্তই। তাঁহারা বিকৃতবুদ্ধি—ঈর্ষ্যা করিয়া কেহ যেন এইরূপ মনে না করেন। ধ্বনির সকল অভাববাদীদের উদ্দেশ্যে এই প্রত্যুত্তর দেওয়া হইল।

ধ্বনি আছেই। সাধারণভাবে দেখিতে গেলে তাহা দুই প্রকারের—অবিবক্ষিতবাচ্য ও বিবক্ষিতান্যপরবাচ্য।

তন্মধ্যে প্রথমটির উদাহরণ—

"তিন শ্রেণীর পুরুষগণ সুবর্ণপুষ্পা পৃথিবী চয়ন করিতে পারেন—শূর, কৃতবিদ্য ও যিনি সেবাপরায়ণ।"

এবং দ্বিতীয়েরও

"হে তরুণি, এই শুকশাবক কোথায় কোন্ শিখরে কত দীর্ঘকাল কি জাতীয় তপস্যা করিয়াছে যাহাতে তোমার অধরের মত শোণরক্তিমবর্ণ বিম্বফলকে আস্বাদন করিতেছে। ইহা তোমাকেই আস্বাদন।"

যদিও বলা হইয়াছে যে ভাক্ত অর্থই ধ্বনি, তবে তাহার প্রত্যুত্তর দেওয়া হইতেছে।

**ভাক্ত অর্থ ও এই ধ্বনি ভিন্ন বলিয়া একরূপ হইতে পারে না।** এই অর্থাৎ উক্তপ্রকার ধ্বনি ভাক্ত অর্থের সহিত একাত্ম হইতে পারে না, যেহেতু ইহাদের রূপ বিভিন্ন। বাচ্য ও বাচকের দ্বারা যেখানে বাচ্যাতিরিক্ত অর্থ তাৎপর্য্যের সহিত প্রকাশিত হয় এবং যেখানে ব্যঙ্গ্য প্রাধান্য লাভ করে তাহাই ধ্বনি। ভাক্ত অর্থ উপচার মাত্র।

ভাক্তত্ব ধ্বনির একটা লক্ষণ যাহাতে না হইতে পারে এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন—

**অতিব্যাপ্তি ও অব্যাপ্তি দোষের জন্য ভাক্তত্ব ধ্বনির লক্ষণ হইতে পারে না॥ ১৪॥**

ভাক্তত্বের দ্বারা ধ্বনি লক্ষিত হয় না। কেন? যেহেতু অতিব্যাপ্তি ও অব্যাপ্তি দোষ হয়। অতিব্যাপ্তি এইজন্য যে যেখানে ধ্বনি নাই সেইসব জায়গায় ভাক্ত অর্থ থাকিতে পারে। যেখানে ব্যঙ্গ্যত্বকৃত মহৎ সৌষ্ঠব নাই, দেখা যায় যে সেইখানেও কবিগণ প্রসিদ্ধ প্রয়োগের অনুসরণ করিয়া লাক্ষণিক অর্থে শব্দ ব্যবহার করেন। যেমন—

"নলিনীপত্রে শয্যা কৃশাঙ্গীর পীনস্তন ও শ্রোণিপুরোভাগের সংঘর্ষে উভয়-প্রান্তে পরিম্লান; মধ্যদেশ তনুদেহের সহিত গাঢ়ভাবে সম্বদ্ধ হয় নাই বলিয়া হরিৎবর্ণ; শিথিল বাহুলতা আক্ষিপ্ত হওয়ার জন্য ইহা বিপর্য্যস্ত। এই নলিনী-পত্রে শয্যা তাহার সন্তাপই বলিতেছে।" সেইরূপ—

"প্রিয়জন শতবার আলিঙ্গিত হইতেছে, সহস্র বার চুম্বিত হইতেছে; বিরামের পর আবার রমণ হইতেছে—ইহাতে কোন পুনরুক্তি নাই।" সেইরূপ—

"কুপিতা, প্রসন্না, রোরুদ্যমানা, হাস্যপরায়ণা—স্বৈরিণী রমণীদিগকে যেভাবে গ্রহণ করা যায় সেইভাবেই তাহারা হৃদয় হরণ করে।"

সেইরূপ—

"কনিষ্ঠা ভার্য্যার স্তনপৃষ্ঠে নবলতার দ্বারা যে প্রহার দান করা হইল তাহা মৃদু হইলেও সপত্নীদের হৃদয়ে দুঃসহ হইল।"

সেইরূপ—

"পরার্থে যে পীড়া অনুভব করে, ভাঙ্গিলেও যে মধুর থাকে, যাহার বিকার সংসারে সকলের কাছে প্রিয়ই হয়, সেই ইক্ষু যদি একেবারে অক্ষেত্রে পতিত হইয়া বৃদ্ধি না পায় তাহা হইলে তাহা কি ইক্ষুর দোষ না উষর মরুভূমির অপরাধ ?"

এখানে ইক্ষুর পক্ষে 'অনুভূতি'-শব্দ। এই জাতীয় প্রয়োগ কখনও ধ্বনির বিষয় হইতে পারে না। যেহেতু—

**যে চারুত্ব অন্য শব্দের দ্বারা প্রকাশ করা যায় না তাহা প্রকাশ করিয়া শব্দ ব্যঞ্জকতা লাভ করিয়া ধ্বনির বিষয় হয়॥ ১৫॥**

এখানে যে সকল উদাহরণ দেওয়া হইল তন্মধ্যে এমন কোন শব্দ নাই যাহা ঠিক সেইরূপ চারুত্ব প্রকাশ করিতেছে যাহা অন্য কোন শব্দের দ্বারা প্রকাশ করা যায় না।

অপিচ—

**লাবণ্যাদি যে সকল শব্দ অন্যবিষয়ে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে তাহা নিজের বিষয় হইতে অন্যত্র প্রযুক্ত হইলেও ধ্বনিপদত্ব লাভ করিতে পারে না ॥ ১৬ ॥**

সেই সকল শব্দে উপচরিত বা লাক্ষণিক ব্যাপার আছে। সেই সমস্ত বিষয়ে যদি কদাচিৎ ধ্বনির সম্ভাবনা থাকে, তাহাও অন্যপ্রকারে প্রবর্ত্তিত হয়; সেই সমস্ত শব্দের দ্বারা তাহা হয় না।

অপিচ—

**যেখানে শব্দের মুখ্যবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া গৌণীবৃত্তির দ্বারা অর্থ বোঝান হয় সেইখানে যে ফল বা প্রয়োজন উদ্দেশ করিয়া শব্দ প্রবর্ত্তিত হয় তাহাতে শব্দের গতি বাধিত হয় না॥ ১৭॥**

চারুত্বাতিশয্যবিশিষ্ট অর্থের প্রকাশনই সেখানে উদ্দেশ্য; যদি মনে করা যায় যে সেই প্রয়োজনকে প্রকাশ করিবার জন্যই শব্দের গৌণ প্রয়োগ হয় তাহা হইলে সেই জাতীয় প্রয়োগ দুষ্টই হইবে। কিন্তু সেইরূপ হয় না। সুতরাং—

**বাচকত্বকে আশ্রয় করিয়াই গৌণীবৃত্তি ব্যবস্থিত হয়। যে ধ্বনির একমাত্র মূল ব্যঞ্জনা, গৌণীবৃত্তি কেমন করিয়া তাহার লক্ষণ হইবে? ১৮॥**

সুতরাং ধ্বনি ও গুণবৃত্তি বিভিন্ন। গৌণীবৃত্তিকে ধ্বনির লক্ষণ মনে করিলে অব্যাপ্তিদোষও হইবে।

বিবক্ষিতান্যপরবাচ্য ধ্বনিপ্রভেদে ইহা লক্ষণ হইতে পারে না। অবশ্য অন্য অনেক প্রকারে ভাক্তত্ব ধ্বনিতে পরিব্যাপ্ত হয়। সুতরাং ভাক্তত্ব ধ্বনির লক্ষণ নহে।

**ভাক্তত্ব কোন কোন ধ্বনিপ্রভেদের উপলক্ষণ হইতে পারে।**

ধ্বনির যে সকল প্রভেদ কথিত হইবে ভাক্তত্ব তাহার কোন একটির উপলক্ষণ হইতে পারে। যদি বলা হয় যে গৌণী বৃত্তিই ধ্বনির লক্ষণ তবে উত্তরে বলা যাইতে পারে যে শুধু অভিধাব্যাপারের দ্বারাই সকল অলঙ্কারবর্গ লক্ষিত হইয়া গেল। তাহা হইলে ভিন্ন ভিন্ন করিয়া প্রত্যেক অলঙ্কারের লক্ষণ করা ব্যর্থ হইয়া পড়ে। পক্ষান্তরে—

**যদি বলা হয় যে ধ্বনির লক্ষণ পূর্ব্বেই করা হইয়াছে তাহা হইলে আমাদের বক্তব্যই সমর্থিত হয়॥ ১৯॥**

যদি ধ্বনির লক্ষণ অন্য লেখকেরাই করিয়া থাকেন তবে আমাদের পক্ষই সমর্থিত হইয়াছে। কারণ আমাদের বক্তব্য এই যে ধ্বনি আছেই। তাহা পূর্ব্বেই সিদ্ধ হইয়া গিয়া থাকিলে আমাদের প্রয়োজন বিনাযত্নে সিদ্ধ হইয়াছে। যাঁহারা এই সহৃদয়হৃদয়সংবেদ্য ধ্বন্যাত্মাকে অনির্ব্বচনীয় বলিয়াছেন তাঁহারা বিবেচনা করিয়া কথা বলেন নাই। যে সকল নিয়মের কথা আমরা বলিয়াছি ও বলিব সেই সকল নিয়মানুসারে ধ্বনির সাধারণ ও বিশেষ লক্ষণ বলা হইলেও যদি তাহা অনির্ব্বচনীয়ই থাকিয়া যায় তাহা হইলে এই অনির্ব্বচনীয়তা সকল বিষয়েই প্রযোজ্য। আর যদি এই অতিশয়োক্তির দ্বারা তাঁহারা ইহাই বুঝাইতে চাহেন যে ইহা অন্য (গুণীভূতব্যঙ্গ্য) কাব্য হইতে অতিরিক্ত কিছু এবং এইভাবে ইহার স্বরূপের আখ্যান করেন তাহা হইলে তাঁহারা যুক্তিযুক্ত কথাই বলিয়াছেন।

ইতি শ্রীরাজানক আনন্দবর্দ্ধনাচার্য্যবিরচিত ধ্বন্যালোকে প্রথম উদ্দ্যোত।

# দ্বিতীয় উদ্দ্যোত

এইভাবে অবিবক্ষিতবাচ্য ও বিবক্ষিতান্যপরবাচ্য নামক ধ্বনির দুই প্রকার প্রকাশিত হইয়াছে। তন্মধ্যে অবিবক্ষিতবাচ্যের প্রভেদ বুঝাইবার জন্য বলা হইতেছে—

**অবিবক্ষিতবাচ্যধ্বনির বাচ্য অর্থ অর্থান্তরে সংক্রমিত হয় অথবা অত্যন্তরূপে আচ্ছন্ন (তিরস্কৃত) হয়। বাচ্যের এই দুই প্রকারের প্রভেদ মানিয়া লওয়া গিয়াছে। ১॥**

এই যে দুই প্রকারের ভেদের কথাও বলা হইল ইহাদের দ্বারা ব্যঙ্গ্যেরই বৈশিষ্ট্য সূচিত হইল। তাই ব্যঙ্গ্যপ্রকাশনপর ধ্বনিরই এই প্রকারভেদ।

তন্মধ্যে অর্থান্তরসংক্রমিতবাচ্যধ্বনির উদাহরণ—

"মেঘসমূহের স্নিগ্ধশ্যামলবর্ণবিশিষ্ট শোভা আকাশে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে; বিকসিত বলাকাশ্রেণী মেঘে সঞ্চরণ করিতেছে; জলকণাবাহী বাতাস বহিতেছে; মেঘবন্ধু ময়ূরগণের সুস্বন কেকাধ্বনি শোনা যাইতেছে। ইহারা যেমন খুসী থাকুক; আমি অতিশয় কঠোরহৃদয় রাম বাঁচিয়া আছি এবং সব সহ্য করিতেছি। কিন্তু বৈদেহীর কি হইবে? হাহা, হা দেবি, তুমি ধৈর্য্য ধারণ কর।"

এখানে 'রাম' শব্দ। যে সমস্ত অন্য ধর্ম্ম ব্যঙ্গ্য হইয়াছে তাহাদের দ্বারা রূপান্তরিত সংজ্ঞীকেই ইহার দ্বারা বোঝান হইতেছে—শুধু সংজ্ঞী রামকেই নহে।

অথবা যেমন মৎপ্রণীত বিষমবাণলীলায়—

"সেই সময়ই গুণ গুণ বলিয়া গৃহীত হয় যখন সহৃদয় ব্যক্তিরা তাহা গ্রহণ করেন। রবিকিরণের দ্বারা গৃহীত হইয়াই কমল কমলপদবাচ্য হয়।"

এখানে দ্বিতীয় 'কমল' শব্দ।

অত্যন্ততিরস্কৃত বাচ্যপ্রভেদের উদাহরণ পাওয়া যায় আদিকবি বাল্মীকির এই শ্লোকে—

"চন্দ্রের সৌভাগ্য সূর্য্যে সংক্রমিত হইয়াছে ; তাহার মুখমণ্ডল তুষারে আবৃত। নিঃশ্বাসান্ধ দর্পণের ন্যায় চন্দ্র প্রকাশিত হইতেছে না।"

এইখানে দ্বিতীয় 'অন্ধ' শব্দ।

"আকাশ মত্তমেঘে আচ্ছন্ন, বনানীর অর্জ্জুন বৃক্ষগুলি ধারাকম্পিত, চন্দ্রের অহঙ্কার বিনষ্ট। কৃষ্ণবর্ণ হইলেও রাত্রিগুলি হৃদয় হরণ করিতেছে।"

এখানে 'মত্ত' ও 'নিরহঙ্কার' শব্দদ্বয়।

**যে ধ্বনির মধ্যে বাচ্য বিবক্ষিত হয় তাহার আত্মার দুইটি ভেদ সুসম্মত—যেখানে প্রকাশের ক্রম বা ব্যবধান লক্ষিত হয় না এবং যেখানে ব্যঙ্গ্য অর্থ ক্রমে প্রকাশিত হয়। ২॥**

মুখ্যভাবে প্রকাশমান ব্যঙ্গ্য অর্থ ধ্বনির আত্মা। সে বাচ্য অর্থের অপেক্ষা রাখে। কখনও কখনও বাচ্য অর্থ হইতে ক্রম বা ব্যবধান লক্ষিত হয় না বলিয়া ইহা বাচ্য অর্থের সঙ্গে সঙ্গেই প্রকাশিত হয়।

তন্মধ্যে :—

**রস, ভাব, তাহাদের আভাস ও প্রশান্তি—ইহাদের প্রকাশে পৌর্ব্বাপর্য্যক্রম লক্ষিত না হইলে এবং ইহারা অঙ্গী ভাবে প্রতিভাত হইলে ধ্বনির আত্মারূপে ব্যবস্থিত থাকে। ৩॥**

রসাদি বিষয় যেন বাচ্যের সহিত এক সঙ্গেই অবভাসিত হয়। তাহা অঙ্গী হইয়া অবভাসিত হইলে ধ্বনির আত্মা হয়।

রসবদ্ অলঙ্কার হইতে যে অসংলক্ষ্যক্রমধ্বনির বিষয় বিভিন্ন তাহা এখন দেখান হইতেছে—

**যে কাব্য বিবিধাত্মক বাচ্যবাচকের চারুত্ব হেতু রসাদির উপর নির্ভর করে তাহা ধ্বনির বিষয়—ইহাই সুসম্মত। ৪॥**

রস, ভাব এবং তাহাদের আভাস ও প্রশান্তির লক্ষণযুক্ত মুখ্য অর্থকে অনুসরণ করিয়া যেখানে শব্দালঙ্কার, অর্থালঙ্কার এবং গুণসমূহ পরস্পরের বৈশিষ্ট্যের জন্য এবং ধ্বনির উপরে নির্ভর করিবার জন্য বিভিন্নরূপে ব্যবস্থিত থাকে, সেই কাব্য ধ্বনি এইরূপ নামকরণ করা যাইতে পারে।

**যেখানে বাক্যের প্রধান অর্থ অন্যত্র থাকে এবং রসাদি যেখানে অঙ্গভূত থাকে সেই কাব্যে রসাদি অলঙ্কার হয়, ইহা আমার মত। ৫ ॥**

যদিও অপরে রসবদ্ অলঙ্কারের বিষয় দেখাইয়াছেন, তবুও আমার মত এই যে যেখানে অন্য অর্থ প্রধানভাবে বাক্যার্থত্ব লাভ করিয়াছে সেইখানে যে সকল রস অঙ্গভূত হইয়াছে তাহারাই রসবদ্ অলঙ্কারের বিষয়। যেমন দেখা যায় যে প্রেয়ঃ অলঙ্কার বাক্যের বিষয়ীভূত হইলে চাটুবাক্যে লিখিত রসাদি অঙ্গভূতই হয়।

সেই রসবদ্ অলঙ্কার অবিমিশ্র (শুদ্ধ) অথবা মিশ্রিত (সঙ্কীর্ণ) হইতে পারে। প্রথমের উদাহরণ—

"তুমি হাসিয়া কি করিবে? বহুদিন পরে তোমার দর্শন পাইয়াছি, আর আমার নিকট হইতে তুমি চলিয়া যাইতে পারিবে না। প্রবাসে থাকিবার জন্য তোমার এই কিরূপ রুচি? হে নিষ্ঠুর, তুমি কেন আমার নিকট হইতে দূরে চলিয়া গিয়াছ? ইহা বলিয়া তোমার শত্রুর স্ত্রীরা প্রিয়তমের কণ্ঠে বাহুবন্ধন নিবিড়ভাবে জড়াইয়া দেয়। স্বপ্নান্তে বুঝিতে পারিয়া তাহারা শূন্যবাহুবলয় হইয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে থাকে।"

এখানে অবিমিশ্র করুণ রস অঙ্গভূত হওয়ায় এই শ্লোক স্পষ্টই রসবদ্ অলঙ্কারের বিষয়। এই জাতীয় বিষয়ে অন্যান্য রসও স্পষ্টই অঙ্গভূত হয়। যেখানে মিশ্রিত (সঙ্কীর্ণ) রসাদি অঙ্গভূত হয় তাহার উদাহরণ—

"শম্ভুর শরাগ্নি সাশ্রুনেত্রা ত্রিপুরযুবতীদিগকে স্পর্শ করিলে তাহারা উহাকে নিরস্ত করিয়া দিল; বসনাঞ্চল ধরিলে তাহারা উহাকে জোরে

তাড়াইয়া দিল, কেশ স্পর্শ করিলে তাহারা উহাকে অনাদর করিয়া দূর করিয়া দিল, পায়ে পড়িলে আবেগজনিত ত্বরায় উহার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল না। আলিঙ্গন করিতে আসিলে তাচ্ছিল্য করিয়া ফিরাইয়া দিল। মনে হয় অগ্নি যেন তাহাদের কামুক প্রণয়ী যে সম্প্রতি অপরাধ করিয়াছে। শম্ভুর এই শরাগ্নি তোমাদিগকে রক্ষা করুক।

এখানে ত্রিপুররিপু শম্ভুর প্রভাবাতিশয্য বাক্যার্থ হইয়াছে এবং শ্লেষযুক্ত ঈর্ষ্যাবিপ্রলম্ভ রস অঙ্গ হইয়াছে। এবংবিধ উদাহরণ রসবদ্ অলঙ্কারের ন্যায্য বিষয়।

অতএব ঈর্ষ্যাবিপ্রলম্ভ এবং করুণ রস যে অঙ্গভাবে ব্যবস্থাপিত হইল ইহা দোষের নহে। যেখানে রস বাক্যের মূল অর্থ সেইখানে কেমন করিয়া সে অলঙ্কার হইবে? ইহা প্রসিদ্ধ যে অলঙ্কার চারুত্বের হেতু। সে তো নিজেই নিজের চারুত্বের হেতু হইতে পারে না।

তাই এইভাবে সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে—

রসভাবাদি তাৎপর্য্যকে আশ্রয় করিয়া যদি অলঙ্কারের সন্নিবেশ করা হয় তাহা হইলে সকল অলঙ্কারই অলঙ্কারত্ব লাভ করে।

সুতরাং যেখানে রসাদি বাক্যের মূল অর্থ সেই সকল জায়গায় রসবদ্ অলঙ্কারের বিষয় পাওয়া যায় না। তাহা ধ্বনির প্রকার। তাহার অলঙ্কার উপমাদি। কিন্তু যেখানে অন্য কোন বিষয় প্রধান হইয়া বাক্যের অর্থ হয় এবং রসাদির দ্বারা চারুত্ব লাভ হয় তাহা রসবদ্ অলঙ্কারের বিষয়।

এইভাবে ধ্বনি, উপমাদি এবং রসবদ্ অলঙ্কারের বিষয় বিভাগ করিয়া দেখান হইল। যদি বলা হয় যে সচেতন প্রাণীর কথা বাক্যের মূল অর্থ হইলে রসবদ্ অলঙ্কারের বিষয় হয় তাহা হইলে উপমাদির বিষয় খুব কমই থাকিবে অথবা একেবারেই থাকিবে না—ইহাই দাঁড়ায়; যেহেতু অচেতনের কথা বাক্যের বিষয় হইলেও কোন না কোন প্রকারে সচেতন

প্রাণীর কাহিনীর যোজনা হইবে। অপর পক্ষ বলিতে পারেন, সচেতনের বৃত্তান্ত যোজনা হইলেও যেখানে অচেতনের কাহিনীই বাক্যের মূল অর্থ তাহা রসবদ্ অলঙ্কারের বিষয় হইতে পারে না। কিন্তু তাহা হইলে রসের আধারস্বরূপ কাব্যপ্রবন্ধ নীরস বলিয়া আখ্যাত হইবে। যেমন—

"সেই অভিমানিনী রমণী আমার বহু অপরাধ দেখিতে পাইয়া কুটিল গতিতে চলিয়া যাইতেছে; কিন্তু সে আমার বিরহ সহ্য করিতে পারিবে না। সে নিশ্চয়ই নদীরূপে পরিণত হইয়াছে—তরঙ্গ তাহার ভ্রূভঙ্গ, চঞ্চল পক্ষিশ্রেণী তাহার মেখলা; উদ্বেগ অথবা ব্যস্ততার জন্য শিথিল ফেনরূপ বসনকে সে আকর্ষণ করিতেছে।" অথবা যেমন—

"এই লতাকে সেই চণ্ডী রমণীর মত দেখাইতেছে—ইহা তন্বী; মেঘজলে ইহার পল্লব আর্দ্র হইয়াছে, যেন অধর। অশ্রুসিক্ত হইয়াছে; ইহা যেন আভরণশূন্য হইয়াছে; নিজের সময় চলিয়া গিয়াছে বলিয়া ইহাতে পুষ্পোদ্গম হইতেছে না।"

"মধুকরের শব্দ নাই, যেন চিন্তায় মৌন অবলম্বন করিয়াছে; আমি তাহার পদতলে পতিত হইলে আমাকে অবজ্ঞা করিয়া যেন অনুতপ্ত হইয়াছে।"

"হে ভদ্র, সেই যমুনা (কলিন্দপর্বতদুহিতা)-তীরস্থিত লতাগৃহগুলির কুশল তো? তাহারা গোপবধূদের বিলাসের সুহৃদ, রাধার গোপন সম্ভোগের সাক্ষী। মদনশয্যা রচনা করিবার জন্য যে সকল পল্লবকে মৃদুভাবে ছেদন করা হইত আমি চলিয়া আসাতে এখন সেই প্রয়োজন আর নাই। আমি জানি সেই পল্লবগুলির নীল দীপ্তি ম্লান হইয়া গিয়াছে এবং তাহারা জীর্ণ হইতেছে।"

এই সকল বিষয়ে অচেতন বস্তুর বর্ণনা মূল বাক্যার্থ হইলেও চেতনবস্তুবৃত্তান্তযোজনা তো আছেই। এখন যদি বলা হয় যে যেখানে

চেতন বস্তুর বৃত্তান্তের যোজনা হয়, সেইখানেই রসবদ্ অলঙ্কার থাকে, তাহা হইলে উপমাদির বিষয় থাকিবে না অথবা খুব কম বিষয়ই থাকিবে, কারণ এমন অচেতনবস্তুবৃত্তান্ত নাই যেখানে অন্ততঃ বিভাবত্বের দ্বারা চেতনবস্তুর কাহিনী যোজনা করা হয় নাই। সুতরাং অঙ্গহিসাবে সন্নিবিষ্ট হইলেই রসাদি অলঙ্কারত্ব লাভ করে। আবার যে ভাব বা রস অঙ্গী এবং সর্ব্বাকারে অলঙ্করণীয় তাহা ধ্বনির আত্মা।

অধিকন্তু

**সেই অঙ্গী অর্থকে যাহারা অবলম্বন করিয়া আছে তাহারা গুণ বলিয়া পরিচিত। অঙ্গকে যাহারা কটকাদির মত আশ্রয় করিয়া থাকে তাহাদিগকে অলঙ্কার বলিয়া মনে রাখিতে হইবে। ৬ ॥**

রসাদি লক্ষণযুক্ত অঙ্গী অর্থকে অবলম্বন করে যাহারা তাহারা গুণ—যেমন শৌর্য্যাদি। যাহারা এই বাচ্যবাচকের লক্ষণযুক্ত অঙ্গগুলিকে আশ্রয় করে তাহারা অলঙ্কার—কটক প্রভৃতির মত।

আরও দেখিতে হইবে :

**শৃঙ্গারই মধুর শ্রেষ্ঠ মনঃপ্রহ্লাদনকারী রস। শৃঙ্গারময় কাব্যকে আশ্রয় করিয়াই মাধুর্য্য অবস্থান করে। ৭ ॥**

শৃঙ্গারই অন্য রস অপেক্ষা মধুর, কারণ তাহা প্রহ্লাদিত করে। তাহার প্রকাশক শব্দ ও অর্থের জন্য কাব্যেরও সেই মাধুর্য্যলক্ষণান্বিত গুণ হয়। শ্রুতিসুখকরতা কিন্তু ওজোগুণেও সমানভাবে আছে।

**শৃঙ্গারে বিপ্রলম্ভে এবং করুণ রসে—মাধুর্য্য যথাক্রমে তারতম্য লাভ করে। কারণ সেইখানে মন অধিকতর দ্রবীভূত হয়। ৮ ॥**

বিপ্রলম্ভশৃঙ্গার ও করুণরসের মধ্যে মাধুর্য্যগুণই বিশেষ প্রকর্ষ লাভ করে। যেহেতু সেইখানে সহৃদয়ের হৃদয় অতিশয় মুগ্ধ হয়।

**কাব্যে যে রৌদ্রাদি রস দীপ্তিগুণের দ্বারা লক্ষিত হয় তাহাদের অভিব্যক্তির হেতু যে শব্দ ও অর্থ, ওজোগুণ তাহাদিগকে আশ্রয় করিয়া থাকে। ৯॥**

রৌদ্রাদি যে সকল রস অতিশয় দীপ্তি বা উজ্জ্বলতার সৃষ্টি করে লক্ষণার দ্বারা তাহাদিগকেই দীপ্তি বলা হইতেছে। তাহার প্রকাশনযোগ্য শব্দ দীর্ঘসমাসের দ্বারা অলঙ্কৃত বাক্য। যেমন—

"হে দেবি, ভীম তাহার সবেগে-আবর্তিত-ভীষণ-গদাভিঘাতের দ্বারা দুর্যোধনের ঊরুযুগল সঞ্চূর্ণিত করিয়া ঘন শোণিতখণ্ডে হাত রক্তাক্ত করিয়া তোমার বেণী উঁচু করিয়া বাঁধিয়া দিবে।"

দীপ্তিপ্রকাশনপর অর্থ দীর্ঘ সমাস রচনার অপেক্ষা রাখে না; তাহা প্রসাদগুণবিশিষ্ট বাচকের দ্বারাও অভিহিত হইতে পারে। যেমন—

"পাণ্ডবীয় সেনাসমূহের মধ্যে যে যে নিজের বাহুবলের গৌরবের অহঙ্কার করিয়া শস্ত্র ধারণ করে, পাঞ্চাল বংশে যে যে শিশু, অধিক-বয়স্ক অথবা গর্ভশয্যাশায়ী, যে যে সেই কর্মের সাক্ষী, আমি রণে অবতীর্ণ হইলে যে যে আমার বিরোধী হইবে তাহাদের মধ্যে যদি স্বয়ং জগতের বিনাশকও থাকেন তাহা হইলেও ক্রোধান্ধ আমি তাঁহার বিনাশ সাধন করিব।"

এই দুইটি শ্লোকেই ওজোগুণ আছে।

**কাব্যের যে গুণ থাকিলে সকল রস স্পষ্ট হইয়া প্রকাশিত হয় তাহার নাম প্রসাদ, তাহা সকল রসে সমানভাবে ক্রিয়া করে। ১০॥**

শব্দ ও অর্থের স্বচ্ছতার নাম প্রসাদগুণ। এই গুণ সকল রসে সমানভাবে থাকে, সকল রচনায়ও। ব্যঙ্গ্য অর্থের অপেক্ষা করিয়াই তাহা মুখ্যভাবে অবস্থান করে—ইহা মনে রাখিতে হইবে।

**শ্রুতিকটুতাদি যে সকল অনিত্য দোষ দেখান হইয়াছে তাহ ধ্বনিমূলক শৃঙ্গারে বর্জ্জন করিতে হইবে এইরূপ নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে। ১১ ॥**

শ্রুতিকটুতা প্রভৃতি যে সকল অনিত্যদোষ সূচিত হইয়াছে শুধু বাচ্য বুঝাইলে অথবা শৃঙ্গারব্যতিরিক্ত অন্য রস ব্যঙ্গ্য হইলে অথবা ধ্বনি আত্মভূত না হইলে তাহারা বর্জ্জনীয় নহে। তবে কি? অঙ্গী রূপে ব্যবস্থিত ধন্যাত্মক শৃঙ্গারেই তাহারা বর্জ্জনীয় এইরূপ নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে। যদি তাহা না হইত, তাহা হইলে অনিত্যতা দোষই হইত না। এইভাবে এই অসংলক্ষ্যক্রমপ্রকাশক ধ্বনির আত্মা সাধারণভাবে প্রদর্শিত হইল।

**অঙ্গী রসের যে সকল প্রভেদ, তাহার অঙ্গপ্রভৃতির যে সকল প্রভেদ এবং তাহাদের পরস্পরের সম্বন্ধ পরিকল্পনা করিলে যে সকল প্রভেদ হয় তাহা অনন্ত। ১২ ॥**

অঙ্গিভাবে ব্যঙ্গ্য যে রসাদি—যাহাকে বলা হইয়াছে বিবক্ষিতান্য-পরবাচ্য ধ্বনির একক আত্মা—তাহার বাচ্যবাচকান্তর্ভূত অলঙ্কারসমূহের যে সকল প্রভেদ তাহা অসংখ্য; তাহার অঙ্গী অর্থের নিজের রস, ভাব, তদাভাস ও তৎপ্রশান্তিলক্ষণযুক্ত, বি ভা ব-অ নু ভা ব-ব্য ভি চা রী-ভাবের প্রতিপাদনসমন্বিত যে সকল বৈশিষ্ট্য তাহাও সীমাহীন। তাহাদের পরস্পরের সম্বন্ধ পরিকল্পনা করিলে যে কোন একটি রসের প্রকারই অনন্ত হইয়া পড়ে; তাহা গণনা করা যায় না। সকল রসের কথা আর ধরিয়া লাভ কি? এইভাবে দেখিলে, এক শৃঙ্গার যদি অঙ্গী হয় তাহা হইলে তাহারই দুই প্রভেদ হইয়া পড়ে—সম্ভোগ ও বিপ্রলম্ভ। সম্ভোগেরও পরস্পরকে প্রেমভরে দর্শন, সুরত, উদ্যানসঞ্চরণাদি লক্ষণযুক্ত নানা প্রকার আছে। বিপ্রলম্ভেরও অভিলাষ, ঈর্ষ্যা, বিরহ, প্রবাস প্রভৃতি—তাহাদের প্রত্যেকের আবার

বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারীর ভেদ আছে। এইভাবে কোন একটি রসকে শুধু নিজের মধ্যে সীমাবদ্ধ করিয়া দেখিলেই পরিমাপ করা যায় না; তাহার আর অঙ্গভেদ পরিকল্পনা করিয়া লাভ কি সেই সকল অঙ্গপ্রভেদের প্রত্যেকটির যদি অঙ্গিপ্রভেদের সঙ্গে সম্বন্ধ পরিকল্পনা করা যায় তাহা হইলে তাহারাও অনন্ত হইবে।

**এই বিষয়ের অংশমাত্র কথিত হইল যাহাতে বুদ্ধিমান্ ব্যুৎপন্ন ব্যক্তিদের বুদ্ধি সর্বত্রই আলোকপ্রাপ্ত হইতে পারিবে। ১৩॥**

অংশমাত্র কথনের দ্বারাই যদি একটি রসভেদে অলঙ্কারের সহিত অঙ্গাঙ্গিভাব জানা হয় তাহা হইলে সহৃদয় ব্যক্তির বুদ্ধি সর্ব্বত্র আলোকপ্রাপ্ত হইবে।

**অঙ্গী শৃঙ্গারের সকল প্রভেদে যদি সর্ব্বত্র একরকমের অনুপ্রাস নিবদ্ধ হয় তাহা হইলে তাহা ব্যঞ্জক হইতে পারে না। কারণ ঐ প্রকারের অনুপ্রাস রচনায় অতিরিক্ত যত্নের প্রয়োজন হয়। ১৪॥**

অঙ্গী শৃঙ্গারের যে সকল প্রভেদ কথিত হইল তাহাদের সবগুলিতেই সমানাকার অনুপ্রাস রচনার প্রবর্ত্তন করা হইলে সেই অনুপ্রাস ব্যঞ্জন হইতে পারে না। অঙ্গী বলার উদ্দেশ্য এই যে যদি শৃঙ্গাররস অঙ্গ হয় তাহা হইলে একরকমের অনুপ্রাস ইচ্ছানুসারে রচনা করা যাইতে পারে।

**যে শৃঙ্গার ধ্বনির আত্মভূত সেইখানে যমকাদি রচনা সম্ভব হইলেও তাহা প্রমাদেরই কারণ হয়—বিশেষ করিয়া বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গারে। ১৫॥**

ধ্বনির আত্মভূত যে শৃঙ্গার, বাচ্যবাচকের দ্বারা যাহার তাৎপর্য্য

প্রকাশ্যমান সেইখানে দুষ্কর শব্দভঙ্গ শ্লেষাদি যমক প্রকারের রচনা সম্ভাব্য হইলেও প্রমাদের কারণ হয়। 'প্রমাদিত্ব' এই শব্দের দ্বারা দেখান হইতেছে যে কাকতালীয়ন্যায়ে কদাচিৎ কোনও একটি যমকের দ্বারা রসনিষ্পত্তি হইলেও, অন্য অলঙ্কারের মত যমকাদিকে রসের অঙ্গরূপে প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য নহে। 'বিপ্রলম্ভে বিশেষতঃ'—ইহার দ্বারা বিপ্রলম্ভশৃঙ্গাররসের সৌকুমার্য্যের আতিশয্য বলা হইতেছে। সেই রস দ্যোতনীয় হইলে যমকাদির অঙ্গরূপে প্রয়োগ অবশ্যপরিহার্য্য। ইহার যুক্তি অভিহিত হইতেছে—

**রস আক্ষিপ্ত হয় বলিয়া যাহার রচনা সম্ভবপর হইয়াছে অথচ যাহার রচনার জন্য পৃথক্ যত্নের প্রয়োজন হয় না ধ্বনি প্রকাশে তাহাই অলঙ্কার বলিয়া সুসম্মত। ১৬ ॥**

যাহা আপনা হইতেই নিষ্পন্ন হইয়াছে তাহার রচনা আশ্চর্য্যজনক হইলেও তাহা যদি রস আক্ষিপ্ত করিয়াই সৃষ্ট হয় তাহা হইলে এই অলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ্যধ্বনিতে সেই অলঙ্কার প্রশংসনীয় বলিয়া গ্রাহ্য হইবে। তাহা যে রসের অঙ্গ ইহাই তাহার সম্পর্কে মুখ্য কথা ; যেমন—

"করতলে গণ্ডদেশ ন্যস্ত রাখিয়াছ বলিয়া সেইখানকার চন্দনপত্ররেখা মুছিয়া গিয়াছে। অমৃতের মত মনোরম তোমার অধররস নিঃশ্বাসের দ্বারা পীত হইয়াছে। কণ্ঠে লগ্ন অশ্রু বারংবার স্তনতট আন্দোলিত করিতেছে ; হে অনুরোধ-বিরূপে, ক্রোধই তোমার প্রিয়, আমি নহি।"

কোন অলঙ্কার রসের অলঙ্কার হইলে তাহার লক্ষণ এই যে তাহার জন্য পৃথক্ যত্ন গ্রহণ করিবার প্রয়োজন হয় না। রসসৃষ্টিতে অভিনিবিষ্টমনা কবি রসসৃষ্টির বাসনা অতিক্রম করিয়া বহু যমক নিবদ্ধ করিতে গেলে বুদ্ধিপূর্ব্বক শব্দান্বেষণরূপ পৃথক্ প্রযত্ন অবশ্যম্ভাবী। যদি বলা যায় যে অন্য অলঙ্কারেও সেইরূপ পৃথক্ প্রযত্নের প্রয়োজন, তাহা হইলে বলিব যে ইহা সত্য নহে। যত্ন করিয়া বাহির করিতে

হইলে অলঙ্কার দুর্ঘট হইলেও প্রতিভাবান্ রসসমাহিতচিত্ত কবির কাছে তাহারা "আমি আগে, আমি আগে" এইরূপ করিয়া আসিয়া পড়ে। যেমন কাদম্বরীতে কাদম্বরীদর্শনাবসরে। অথবা যেমন সেতুবন্ধ মহাকাব্যে মায়া রামের শিরোদর্শনে বিহ্বলা সীতাদেবীর বর্ণনায়। ইহা যুক্তিযুক্তই, কারণ রস বাচ্যবিশেষের দ্বারা আক্ষিপ্ত করিতে হইবে। রূপকাদি অলঙ্কারবর্গ বাচ্যবিশেষ; তাহারা রস-প্রতিপাদক শব্দের দ্বারা রস প্রকাশ করে। সুতরাং রসাভিব্যক্তিতে তাহারা বহিরঙ্গ নহে। কিন্তু যমকাদি দুষ্করমার্গে বহিরঙ্গত্ব অবশ্য-স্বীকার্য্য। যদিও যমকাদির এমন কোন দৃষ্টান্ত দেখা যায় যেখানে তাহা রসশালী তবু সেইখানে যমকাদিই অঙ্গী। আর রসাভাসস্থলে অঙ্গত্বও বিরুদ্ধ নহে; যেহেতু রস যেখানে অঙ্গিরূপে ব্যঙ্গ্য হয় সেইখানে যমকাদির জন্য পৃথক্ যত্নের প্রয়োজন হয় বলিয়া তাহা অঙ্গ হইয়া থাকে না। এই যে অর্থ ইহাই নিম্নে সংগ্রহশ্লোকে দেওয়া হইল :—

"কোন কোন স্থলে রসবিশিষ্ট ও অলঙ্কারসমন্বিত বস্তু মহাকবির এক প্রচেষ্টাতেই সম্পন্ন হয়।"

"কবি শক্তিমান্ হইলেও যমকাদি রচনায় তাঁহার পৃথক্ যত্ন লাগে, তাই ইহারা রসের অঙ্গ হইতে পারে না।"

"রসাভাসে যমকাদির অঙ্গত্ব বাধিত হয় না। কিন্তু যে শৃঙ্গারে ধ্বনি আত্মা হইয়াছে তাহার মধ্যে ইহাদের অঙ্গত্ব সাধিত হয় না।"

যে শৃঙ্গারে ধ্বনি আত্মভূত হইয়াছে তাহার সম্পর্কিত ব্যঞ্জক অলঙ্কারের কথা এখন বলা হইতেছে :—

**রূপকাদি অলঙ্কারবর্গ ধ্বন্যাত্মভূত শৃঙ্গারে বিবেচনার সহিত সন্নিবেশিত হইলে যথার্থতা লাভ করে। ১৭ ॥**

বাহ্য অলঙ্কারের ন্যায় কাব্যালঙ্কারও অঙ্গীর চারুত্বহেতু বলিয়া

কথিত হইয়াছে। রূপকাদি বাচ্য অলঙ্কারবর্গ—যাঁহাদের কথা বলা হইয়াছে অথবা অলঙ্কার অনন্ত বলিয়া অন্য কাহারও দ্বারা কথিত হইবে—তৎসমুদায় যদি বিবেচনার সহিত সন্নিবেশিত হয়, তাহা হইলে তাহারা সবাই অঙ্গী অলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ্য ধ্বনির চারুত্বহেতু হইবে। অলঙ্কার সন্নিবেশ করিতে হইলে যে বিবেচনার প্রয়োজন তাহা এই :—

**অলঙ্কার রসের উপরে নির্ভরশীল ভাবেই বিবক্ষিত হইবে; তাহা কখনও অঙ্গী হিসাবে বিবক্ষিত হইবে না। তাহা অবসর মত গৃহীত ও ব্যক্ত হইবে এবং অত্যন্তরূপে তাহার নির্ব্বাহ হউক এইরূপ ইচ্ছা থাকিবে না। ১৮ ॥**

**যদি অত্যন্তরূপে তাহার নির্ব্বাহ হয়ও তাহা হইলেও যত্ন সহকারে লক্ষ্য করিতে হইবে যে তাহা যেন অঙ্গ হিসাবেই থাকে—এইভাবেই রূপকাদি অলঙ্কারবর্গের অঙ্গত্ব সাধিত হয়। ১৯ ॥**

রসসৃষ্টিতে অত্যধিক মনোনিবেশ করিয়া কবি যে অলঙ্কারকে অঙ্গরূপে গ্রহণ করেন তাহার দৃষ্টান্ত :

"হে মধুকর, তুমি এই চপলকটাক্ষবিশিষ্টা কম্পমানা রমণীর নয়ন বহু বার স্পর্শ করিতেছ। তুমি ইহার কর্ণের কাছে যাইয়া অন্তরঙ্গ বন্ধুর মত মৃদু শব্দ করিতেছ। যে তোমার ভয়ে হাত প্রকম্পিত করিতেছে তাহার রতিসর্ব্বস্বরূপ অধর তুমি পান করিতেছ। আমরা তত্ত্বান্বেষণ করিতে যাইয়া পরাস্ত হই; বাস্তবিক পক্ষে তুমিই ভাগ্যবান্।"

এখানে যে ভ্রমরস্বভাবোক্তি-অলঙ্কার আছে তাহা রসের অনুকূলই। নাঙ্গিত্বেন—প্রধানভাবে নহে। কদাচিৎ কোন অলঙ্কার পূর্ব্বে রসাদির উপকরণ হিসাবে বিবক্ষিত হইলেও পরে অঙ্গিভাবে বিবক্ষিত হইতে দেখা যায়। যেমন—

"যিনি আদেশচ্ছলে সুদর্শনচক্রের আঘাতে রাহুবধূদের রতোৎসব উদ্দাম-আলিঙ্গন-বিলাসশূন্য চুম্বনমাত্রে নিঃশেষিত হইতে বাধ্য করিয়াছিলেন।"

এখানে রসাদি তাৎপর্য্য থাকিলেও পর্য্যায়োক্ত অলঙ্কার অঙ্গিভাবে বিবক্ষিত হইয়াছে। অঙ্গহিসাবে বিবক্ষিত হইলেও যাহাকে অবসরমত গ্রহণ করা হয়, অনবসরে নহে। অবসরে গ্রহণ যথা—

"এই পুরোবর্ত্তিনী লতাকে আজ কামমোহিত নারীর মত দেখিতেছি —ইহার কলিকা উদ্গত (উৎকলিকা) হইয়াছে, ইহার বর্ণ পাণ্ডুর, ইহার বিকাশ আরম্ভ হইয়াছে, বায়ুর (শ্বসনের) উল্লাসে ইহার দেহ আন্দোলিত হইয়াছে। ইহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াছি বলিয়া আমি নিশ্চয়ই দেবীর মুখ কোপকষায়িত করিয়া দিব।"

এখানে উপমাশ্লেষকে অবসর মত গ্রহণ করা হইয়াছে। গ্রহণ করিয়াও যে অলঙ্কারকে অবসরমত ত্যাগ করা হয় তাহা রসের আনুকূল্যের জন্য অন্য অলঙ্কারের অপেক্ষায় করা হইয়া থাকে। যেমন—

"হে অশোক, তুমি নবপল্লবে অনুরঞ্জিত; প্রিয়ার যে সকল গুণ আছে আমি তাহাদের প্রতি অনুরক্ত। হে সখে, পুষ্প হইতে মুক্ত ভ্রমর তোমার উপরে আপতিত হয়। আমার উপরেও মদনের পুষ্পধনু হইতে বিমুক্ত বাণ আসিয়া পড়ে।

প্রিয়ার পদাঘাত তোমার আনন্দদায়ক হয়, আমারও। আমাদের সবই তুল্য। কেবল বিধাতা আমাকে স-শোক করিয়াছেন।"

এখানে শ্লেষ অলঙ্কার রচনানিবদ্ধ হইলেও ব্যতিরেকের অপেক্ষায় পরিত্যক্ত হইয়া রসবিশেষেরই পরিপোষক হইয়াছে। এখানে অলঙ্কারদ্বয়েরও সংমিশ্রণ হয় নাই। তবে কি? যদি বলা হয় ইহা নরসিংহবৎ শ্লেষব্যতিরেকে লক্ষণযুক্ত অন্য অর্থাৎ সঙ্কর অলঙ্কার, তাহা হইলে বলিব, তাহা নহে; যেহেতু সঙ্কর অলঙ্কার অন্যরূপে ব্যবস্থাপিত

হয়। যেখানে শ্লেষবিষয়ক শব্দেই প্রকারান্তরে ব্যতিরেকের প্রতীতি জন্মায় তাহা সঙ্কর অলঙ্কারের বিষয়। যেমন—"তিনি হরিনামা দেব ; আপনি শ্রেষ্ঠ হরি (অশ্ব)-নিবহসমন্বিত ; তাই আপনি সহরি" ইত্যাদিতে। এইখানে ("রক্তস্ত্বং" ইত্যাদিতে) শ্লেষ ও ব্যতিরেকের বিষয় বিভিন্ন। এই জাতীয় বিষয়ে অলঙ্কারান্তরের অর্থাৎ সঙ্কর অলঙ্কারের কল্পনা করিলে সংসৃষ্টি অলঙ্কারের আর কোন বিষয় থাকে না। শ্লেষের পথেই ব্যতিরেক অলঙ্কার স্বীয় বৈশিষ্ট্যে উপনীত হইয়াছে বলিয়া এখানে সংসৃষ্টি হইতে পারে না—যদি এইরূপ বলা হয় তাহা হইলে যুক্তিযুক্ত হইবে না। কারণ প্রকারান্তরেও ব্যতিরেক পাওয়া যাইতে পারে। যেমন—

"যে প্রলয়ঙ্কর নিদারুণ বায়ু পর্ব্বতকেও দলন করিতে পারে তাহা যে বর্ত্তিকাকে নির্ব্বাপিত করিতে পারে না, দিবাভাগে তিমিররূপ কজ্জলদ্বারা যাহার সুপ্রকাশ পরমোজ্জ্বল দীপ্তি মলিন হয় না, 'পতঙ্গ' হইতে যাহার ধ্বংস না হইয়া উৎপত্তিই হইয়া থাকে,—নিখিল বিশ্বের প্রকাশক সূর্য্যের দীপ্তিরূপ অভিনব বর্ত্তিকা তোমাদের সুখদান করুক।"

এখানে সাম্যবাচক শব্দের নিবন্ধন ছাড়াই ব্যতিরেকের প্রতিপাদন করা হইতেছে। এখানে (রক্তস্ত্বং ইত্যাদিতে) শুধু শ্লেষ হইতে চারুত্বের প্রতীতি হয় নাই ; অতএব শ্লেষ ব্যতিরেকের অঙ্গ রূপেই বিবক্ষিত হইয়াছে, স্বতন্ত্র অলঙ্কাররূপে হয় নাই—এই কথা বলা যুক্তিযুক্ত হয় না। কারণ এবংবিধ বিষয়ে সাম্যমাত্র হইতেই চারুত্বের সুষ্ঠুভাবে প্রতিবাদ হয় এমনও দেখা যায়। যেমন—

"হে সখে জলধর, আমার ক্রন্দন তোমার গর্জ্জনের সহিত তুলনীয় ; আমার অশ্রুপ্রবাহ তোমার অশ্রান্ত বারিধারার সঙ্গে তুলনীয় ; তাহার বিচ্ছেদজাত শোকাগ্নি বিদ্যুৎ বিলাসের সহিত তুলনীয় ; আমার অন্তঃস্থিত প্রিয়ামুখ তোমার অভ্যন্তরে নিহিত চন্দ্রের মত। তোমার ও

আমার ব্যাপার একই রকমের। তবে তুমি কেন আমাকে সর্বদা দগ্ধ করিতে উদ্যত হইয়াছ ?"

এই সব শ্লোকে। রসনির্ব্বাহে সর্ব্বথা নিবিষ্টমনা কবি যে অলঙ্কারকে একান্ত-ভাবে পরিপূর্ণ করিতে চাহেন না তাহার দৃষ্টান্ত—

"সন্ধ্যাকালে কোমল, চঞ্চল বাহুলতিকাপাশের দ্বারা স্বামীকে কোপভরে দৃঢ়ভাবে বাঁধিয়া বাসনিকেতনে আনিয়া বধূ কাঁদিতে কাঁদিতে সখীদের কাছে স্বামীর দুষ্কর্ম অঙ্গুলি নির্দ্দেশ প্রভৃতির দ্বারা সূচিত করিয়া 'এই-ব্যক্তি পুনরায় এইরূপ করিবে না' আবেগভঙ্গুর মধুর কণ্ঠে এই কথা বলিয়া তাহাকে আঘাত করিতেছে। সে হাসিয়া নিজের অপরাধ ঢাকিয়া ধন্য হইতেছে।"

এখানে রূপক আক্ষিপ্ত হইয়াছে, কিন্তু রসের পরিপোষকতার উদ্দেশ্যে অসমাপ্ত রহিয়া গিয়াছে। অলঙ্কার পরিপূর্ণরূপে নিষ্পন্ন হউক এইরূপ অভিপ্রায় সত্ত্বেও তাহা যাহাতে অঙ্গরূপে থাকে তজ্জন্য কবি অবহিত হয়েন। যেমন—

"হে ভীরু, আমি প্রিয়ঙ্গুলতিকায় তোমার অঙ্গ, চকিতহরিণীর নয়নে তোমার দৃষ্টিপাত, চন্দ্রে তোমার শোভা, ময়ূরের বর্হভারে তোমার কেশ, শীর্ণশরীরা নদীর ঊর্ম্মিমালায় তোমার ভ্রূবিলাস আছে বলিয়া মনে করি। অহো, কোন এক স্থানে তোমার সাদৃশ্য সমগ্রভাবে নাই।" ইত্যাদিতে।

এইভাবে যে অলঙ্কার বিরচিত হয় তাহা কবির রসাভিব্যক্তির কারণ হয়। যদি অলঙ্কার এই প্রয়োগপ্রণালী অতিক্রম করে তাহা হইলে অবশ্যই রসভঙ্গ হইবে। মহাকবিদের রচনায়ও বহুবার এই জাতীয় পদার্থ (রসভঙ্গ) দেখা যায়। কিন্তু যে সকল মহাত্মা সহস্র সুন্দর উক্তির দ্বারা নিজদিগকে প্রকাশ করিয়াছেন তাঁহাদের দোষ ঘোষণা নিজেরই দোষ দেখান হইবে বলিয়া পৃথক্‌ভাবে দেখান হইল না।

কিন্তু রসাদিবিষয়ের ব্যঞ্জনায় রূপকাদি অলঙ্কারবর্গের সমীক্ষাসহকারে প্রয়োগের যে পদ্ধতি আংশিকভাবে দেখান হইল তাহা অনুসরণ করিয়া সমাহিতচেতা সুকবি স্বয়ং অন্যলক্ষণ নির্দেশ করিয়া যদি বক্ষ্যমাণ অলক্ষ্যক্রমধ্বনির আত্মা উপনিবদ্ধ করেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তিনি পরম চরিতার্থতা লাভ করিবেন।—

**(এই বিবক্ষিতান্যপরবাচ্য ধ্বনির) যে অনুরণনরূপ আত্মা ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হয়, শব্দ ও অর্থশক্তিমূলত্বের জন্য তাহাও দুই প্রকারের হইয়া থাকে। ২০ ॥**

ইহার অর্থাৎ বিবক্ষিতান্যপরবাচ্য ধ্বনির যে আত্মা তাহার ব্যঞ্জনা ক্রমে ক্রমে সংলক্ষিত হয়, তাহার অনুরণন নাম দেওয়া হইয়াছে; তাহাও শব্দশক্তিমূলক ও অর্থশক্তিমূলক এই দুই প্রকারের হইয়া থাকে। আপত্তি হইতে পারে যে শব্দশক্তিবশতঃ যে অর্থান্তর প্রকাশিত হয় তাহাকে যদি ধ্বনির প্রকার বলি তাহা হইলে শ্লেষের বিষয়ই অপহৃত হইবে। কিন্তু তাহা নহে—এই জন্য বলিতেছেন

**কাব্যে যে অলঙ্কার শব্দের দ্বারা উক্ত না হইয়া শব্দশক্তির দ্বারা আক্ষিপ্ত হইয়া প্রকাশিত হয়, তাহাই শব্দশক্ত্যুদ্ভব ধ্বনি। ২১ ॥**

যেহেতু অলঙ্কার—বস্তুমাত্র নহে—কাব্যে শব্দশক্তির দ্বারা প্রকাশিত হয় তাহাই শব্দশক্ত্যুদ্ভব ধ্বনি—ইহাই আমাদের বিবক্ষিত। কিন্তু যদি শব্দশক্তির দ্বারা দুইটি বস্তু প্রকাশিত হয় তাহা হইলে তাহা শ্লেষ অলঙ্কার হইবে। যেমন—

"যিনি অন বা শকটাসুরকে নিধন করিয়াছিলেন, যিনি অজন্মা, যে দেহের দ্বারা দানবেরা জিত হইয়াছিল তাহাকে অতীতকালে যিনি স্ত্রীরূপে পরিণত করিয়াছিলেন, যিনি উদ্ধত ভুজঙ্গ কালিয়কে হত্যা করিয়াছিলেন এবং যিনি রবে (অ-কারে) লীন হইয়াছেন, যিনি

গোবর্দ্ধন পর্ব্বত (অগং) ও পৃথিবী (গাং) ধারণ করিয়াছিলেন, শশীকে যে মথিত করে সেই রাহুর যিনি শিরশ্ছেদন করিয়াছেন, অমরবৃন্দ যাঁহার নাম স্তবযোগ্য বলিয়াছেন, যিনি স্বয়ং অন্ধক অর্থাৎ যাদবদের বাসভূমি নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন এবং তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়াছেন, যিনি সর্ব্বদাতা, সেই মাধব তোমাকে রক্ষা করুন।" (বিষ্ণুপক্ষে) অথবা "যিনি মনোভব বা কন্দর্পকে ধ্বংস করিয়াছেন, যে বিষ্ণু বলীকে জয় করিয়াছেন তাঁহার দেশকে যিনি পুরাকালে অস্ত্রে পরিণত করিয়াছিলেন, উদ্ধত ভুজঙ্গ যাঁহার হার ও বলয়, চন্দ্র যাঁহার শিরে, যিনি গঙ্গাকে ধারণ করিয়াছেন, যাঁহার হরনাম স্তবযোগ্য বলিয়া অমরবৃন্দ বলিয়াছেন, যিনি অন্ধকাসুরকে নিধন করিয়াছেন, সেই উমাপতি তোমাকে রক্ষা করুন।" (শিবপক্ষে)

আপত্তি হইতে পারে—উদ্ভটভট্ট প্রভৃতি বলিয়াছেন যে অন্য অলঙ্কার প্রতিভাত হইলেও তাহার নাম শ্লেষই দিতে হইবে; সুতরাং শব্দ-শক্তিমূলক ধ্বনির অবকাশ থাকে না। এই আশঙ্কা করিয়াই বলিতেছেন —শব্দ শক্তির দ্বারা 'আক্ষিপ্ত'। তাই অর্থ এই—যেখানে শব্দশক্তির দ্বারা অলঙ্কার প্রতীয়মান না হইয়া সাক্ষাৎভাবে বাচ্য হয় তাহা সবই শ্লেষের বিষয়। কিন্তু যেখানে শব্দশক্তির সামর্থ্যের দ্বারা বাচ্যব্যতিরিক্ত অন্য অলঙ্কার আক্ষিপ্ত হয় তাহা ব্যঙ্গ্য হইয়াই প্রকাশিত হয় এবং তাহা ধ্বনির বিষয়। শব্দশক্তির দ্বারা সাক্ষাৎভাবে অন্য অলঙ্কারের প্রকাশের উদাহরণ, যেমন—

"স্বভাবতঃ মনোহারী তাহার স্তনযুগলে হার না থাকিলেও তাহারা কাহার না বিস্ময় সঞ্চার করিয়াছিল?"

এখানে শৃঙ্গাররসের ব্যভিচারী ভাব বিস্ময় এবং বিরোধ অলঙ্কার সাক্ষাৎভাবে প্রতিভাত হইতেছে। অতএব ইহা বিরোধ অলঙ্কারের অনুগ্রাহক শ্লেষেরই বিষয়, অনুস্বানোপম ব্যঙ্গ্যের বিষয় নহে। কিন্তু

অলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ্য ধ্বনিতে শ্লেষ বা বিরোধ অলঙ্কার বাচ্য হইয়াই ব্যঞ্জনার বিষয় সৃষ্টি করিতে পারে। যেমন আমারই লিখিত শ্লোকে—

"যিনি হস্তে সুদর্শনচক্র ধারণ করিয়াছেন, যিনি নিজ সুললিত চরণারবিন্দের দ্বারা সমগ্রজগৎকে ব্যাপ্ত করিয়াছেন এবং যিনি চন্দ্রকে চক্ষুরূপে ধারণ করিয়াছেন তিনি যে রুক্মিণীকে স্বীয় তনুর অপেক্ষা অধিক দেখিতেন ইহা যুক্তিযুক্তই, কারণ রুক্মিণীর অশেষ তনু প্রশংসনীয়, তাঁহার সর্ব্বাঙ্গের লীলায় ত্রিলোক জিত হইয়াছে; তাঁহার মুখ নিরবশেষ লাবণ্যযুক্ত ও চন্দ্রসদৃশ। সেই রুক্মিণী তোমাদিগকে রক্ষা করুন।"

এখানে ব্যতিরেকছায়ানুগ্রাহী শ্লেষ বাচ্য হইয়াই প্রতীত হইতেছে। আরও যেমন—

"জলদভুজগজাত বিষ (জল) বিরহিণী নারীতে শিরোঘূর্ণন, বিষয়ে অনভিলাষ, মানসিক ঔদাস্য, বাহ্য ইন্দ্রিয়ের বৈকল্য, মূর্চ্ছা, অন্ধতা, শরীরপীড়া ও মুমূর্ষুতা হঠাৎ আনয়ন করে।" অথবা যেমন—

"গজেন্দ্র যেমন মানসসরোবরের কাঞ্চন পঙ্কজ দলিত করিয়া তাহার সৌরভকে মথিত করে তোমার বাহুপরিঘও শত্রুর মানস পঙ্কজে সেইরূপ করিয়া থাকে। গজেন্দ্র যেমন অবিশ্রান্ত মদজল নির্মুক্ত করিয়াও সঙ্কুচিত হয় না তোমার বাহুপরিঘও সেইরূপ দান করিয়া সঙ্কুচিত হয় না।"

এখানে রূপকচ্ছায়ানুগ্রাহী শ্লেষ বাচ্য হইয়াই অবভাসিত হইতেছে। যেখানে সেই শ্লেষ অলঙ্কার আক্ষিপ্ত হইয়াও পুনরায় অন্য শব্দের দ্বারা অভিহিত হয় সেইখানে শব্দশক্ত্যুদ্ভব অনুরণনরূপ ব্যঙ্গ্যধ্বনির ব্যবহার হয় নাই। সেখানে বক্রোক্তি প্রভৃতি বাচ্য অলঙ্কারেরই ব্যবহার হইয়া থাকে। যেমন—

"হে কেশব, গো-পরাগে (গোধূলিতে) হৃতদৃষ্টি হওয়ায় আমি তো

কিছুই দেখিতে পাই না। সেই জন্যই, হে নাথ, আমি স্খলিতা হইয়াছি। তুমি কেন পতিতাকে অবলম্বন করিতেছ না? বিষম বা বন্ধুর পথে (বিষমেষু বা কন্দর্পের দ্বারা) খিন্নহৃদয়া রমণীগণের তুমিই একমাত্র গতি—ইহা গোপিনীরা নানা ইঙ্গিতে সূচনা করিয়া বলিয়া থাকে। গোষ্ঠে তুমি আমাদিগকে চিরকাল রক্ষা কর।"

এই জাতীয় সবই অনায়াসে বাচ্য শ্লেষের বিষয় হয় তো হউক। কিন্তু যেখানে অর্থসামর্থ্যের দ্বারা আক্ষিপ্ত হইয়া অন্য অলঙ্কার শব্দশক্তির দ্বারা প্রকাশিত হয় তাহা সবই ধ্বনির বিষয়। যেমন—

"এমন সময় কুসুমসময়যুগ সমাপন করিয়া ফুল্লমল্লিকাধবলাট্টহাস-সমন্বিত গ্রীষ্মনামা মহাকাল বিকশিত হইল।" [এখানে মহাকালাখ্য শিবের অভ্যাগম ধ্বনিত হইতেছে।] আবাব যেমন—

"তন্বীর উন্নত, উল্লসিতহারবিশিষ্ট, অগুরুসদৃশ কৃষ্ণবর্ণ পয়োধরভার কাহার মনে না অভিলাষের সঞ্চার করিল?" অথবা যেমন—

"দীপ্তাংশুর রশ্মিসমূহ সময়ে জল আকর্ষণ ও উৎসর্জ্জন করিয়া প্রজা-সমূহের আনন্দদান করে।"

[গাভীগণের দুগ্ধ যথাসময়ে দোহন করা হয় এবং উৎসৃষ্ট হয় বলিয়া তাহারাও জনসাধারণের আনন্দ দান করে।]

"তাঁহার রশ্মিজাল পূর্ব্বাহ্নে চতুর্দ্দিকে বিস্তীর্ণ হয়, দিনান্তে সংহরণ করা হয়।"]

[গাভীগণ পূর্ব্বাহ্নে বিক্ষিপ্ত হইয়া চরিয়া বেড়ায়; দিনান্তে আবার একত্রীকৃত হয়।]

"এই রশ্মিগুলি [ও গাভীগুলি] দীর্ঘ দুঃখের আধার সংসারে জন্ম প্রভৃতির ভয়সঙ্কুল সমুদ্র পার হওয়ার অর্ণবযান। [গাবঃ—রশ্মিসমূহ ও গাভীসমূহ।]"

প্রস্তাবিত বিষয়ের সঙ্গে অসম্বন্ধ কোন অর্থে অভিধাশক্তি প্রসক্ত

হইবে না। তাই এই সকল উদাহরণে প্রকরণবহির্ভূত অন্য অর্থ শব্দশক্তির দ্বারা প্রকাশিত হইতেছে বলিয়া অর্থের সামর্থ্যের জন্য প্রাসঙ্গিক (প্রাকরণিক) ও অপ্রাসঙ্গিক অর্থের মধ্যে উপমান-উপমেয়সম্বন্ধ কল্পনা করিতে হইবে। এই শ্লেষ অর্থের দ্বারা আক্ষিপ্ত, সাক্ষাৎভাবে শব্দনিষ্ঠ নহে। অতএব শ্লেষ অলঙ্কার ও অনুস্বানোপমব্যঙ্গ্যধ্বনির বিষয় বিভিন্নই। শব্দশক্তিমূলক অনুস্বানোপমব্যঙ্গ্যের স্থলে অন্যান্য অলঙ্কারও থাকিতে পারে। এইভাবে শব্দশক্তিমূলক বিরোধ-অলঙ্কারও দেখা যাইতে পারে। যেমন ভট্ট বাণের থানেশ্বর নামক জনপদবর্ণনায়—

"যেখানে প্রমদারা মাতঙ্গগামিনী এবং শীলবতীও, গৌরী এবং বিভবরতাও, শ্যামা এবং পদ্মবর্ণাও, শ্বেতদন্তের জন্য শুচিবদনা এবং মদিরসুগন্ধিনিঃশ্বাসবিশিষ্টাও।"

এখানে বিরোধ-অলঙ্কার অথবা বিরোধ-অলঙ্কারের ছায়ানুগ্রাহী শ্লেষ-অলঙ্কার বাচ্য হইয়াছে এইরূপ বলা যাইতে পারে না, কারণ বিরোধ-অলঙ্কার এখানে সাক্ষাৎভাবে শব্দের দ্বারা প্রকাশিত হইতেছে না। যেখানে শ্লেষোক্তিতে বিরোধ অলঙ্কার সাক্ষাৎভাবে শব্দের দ্বারা নিবেদিত হয় সেখানে শ্লেষ ও বিরোধ অলঙ্কারদ্বয়ের বিষয় পাওয়া যায়। যেমন সেই হর্ষচরিতেই—"বিরোধী পদার্থের সমবায়ের মত। যেমন—নব তমোরাশি সন্নিহিত হইলেও উজ্জ্বলমূর্ত্তি সূর্য্য" ইত্যাদিতে।

অথবা যেমন আমারই রচিত নিম্নলিখিত শ্লোকে—

"যিনি অক্ষয় (গৃহহীন) অথচ সকলের একমাত্র আশ্রয়, যিনি অধীশ অথচ ধীর ঈশ্বর, যিনি ক্রিয়াকুশল অথচ নিষ্ক্রিয়, যিনি অরিবিনাশক অথচ চক্রধর, যিনি কৃষ্ণ (কৃষ্ণবর্ণ) অথচ হরি (হরিৎবর্ণ) তাঁহাকে নমস্কার কর।"

এইভাবে ব্যতিরেক-অলঙ্কারের প্রয়োগও দেখা যায়। যেমন আমারই রচিত শ্লোকে—

"দিনপতির যে পাদ অর্থাৎ কিরণসমূহ অন্ধকার বিনষ্ট করিয়া (খ) আকাশকে উজ্জ্বল করে অথবা যে পাদ নখের দ্বারা উদ্ভাসিত অথচ গগনে উদ্ভাসিত হয় না, যাহারা পদ্মের শ্রীবৃদ্ধি করে আবার যাহাদের শ্রী পদ্মের শোভাকে নিন্দনীয় করে, যাহারা ক্ষিতিধরের (পর্ব্বত ও রাজা) মস্তকে প্রদীপ্ত হয়, যাহারা অমরবৃন্দের (বা চামরসমূহের) শিরোদেশে পরিব্যাপ্ত হয় দিনপতির সেই উভয় প্রকারের পাদই তোমার সম্পদবৃদ্ধির কারণ হউক।"

শব্দশক্তিমূলক অনুস্বানরূপ ব্যঙ্গ্য ধ্বনির অন্যান্য যে সকল প্রকার আছে তাহা সহৃদয় ব্যক্তিরা নিজেরাই অনুসরণ করিবেন। এখানে গ্রন্থস্ফীতির ভয়ে তাহার বিস্তারিত আলোচনা করা হইল না।

**শব্দশক্ত্যুদ্ভব হইতে পৃথক্ অর্থশক্ত্যুদ্ভব ধ্বনি সেইখানেই হয় যেখানে অর্থ অর্থশক্তি হইতে সঞ্জাত হইয়া সম্যক্‌রূপে প্রকাশিত হয়, যেখানে সাক্ষাৎ উক্তির সাহায্য ছাড়া ব্যঙ্গ্য অর্থের দ্বারাই অন্য বস্তু প্রকাশ করিয়া অর্থ নিজে প্রকাশিত হয়। ২২॥**

"দেবর্ষি এইরূপ বলিলে পার্ব্বতী অধোমুখী হইয়া পিতার পার্শ্বে বসিয়া লীলাকমলের পত্র গণনা করিতে লাগিলেন।"

এখানে লীলাকমলের পত্রগণনা নিজের স্বরূপকে (বাচ্য অর্থ) গৌণ করিয়া শব্দব্যাপার ছাড়াই ব্যভিচারিভাবরূপ অন্য অর্থ প্রকাশ করিতেছে। ইহা কিন্তু অসংলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ্য ধ্বনির বিষয়ই নহে। যেহেতু যেখানে শব্দের দ্বারা সাক্ষাৎভাবে নিবেদিত বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারী ভাব হইতে রসাদির প্রতীতি হয়, কেবল তাহাই ইহার (অসংলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ্যের) মার্গ। যেমন কুমারসম্ভবে বসন্তবর্ণনা-প্রসঙ্গে বসন্তপুষ্পাভরণযুক্তা দেবীর আগমন হইতে মদনের শরসন্ধান পর্য্যন্ত বর্ণন এবং কথঞ্চিৎ বিচলিতধৈর্য্য শম্ভুর চেষ্টাবিশেষের বর্ণনাদি

সাক্ষাৎভাবে শব্দের দ্বারা প্রকাশিত হইয়াছে। এখানে কিন্তু অর্থসামর্থ্যের দ্বারা আক্ষিপ্ত ব্যভিচারী ভাবের পথেই রসের প্রতীতি হয়। সেই কারণে ইহা ধ্বনির অন্য এক প্রকার। কিন্তু যেখানে শব্দব্যাপারের সাহায্যে এক অর্থ অন্য অর্থের ব্যঞ্জক বলিয়া গৃহীত হয় তাহা এই ধ্বনির বিষয় নহে। যেমন—

"উপপতিকে সঙ্কেতকালের প্রতি উন্মুখী জানিয়া বিদগ্ধা নায়িকা হাস্যময় নেত্রের দ্বারা অভিপ্রায় সূচনা করিয়া লীলাপদ্ম নিমীলিত করিল।"

এখানে লীলাকমল নিমীলনের ব্যঞ্জকত্ব উক্তির দ্বারাই সাক্ষাৎভাবে নিবেদিত হইয়াছে।

অধিকন্তু—

**শব্দ, অর্থ ও শব্দার্থ—ইহাদের দ্বারা আক্ষিপ্ত ব্যঙ্গ্য অর্থকে কবি যেখানে পুনরায় নিজের উক্তির দ্বারা আবিষ্কার করেন তাহা (সংলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ্য) ধ্বনি হইতে বিভিন্ন। তাহা বাচ্যালঙ্কার। অথচ তাহা (অসংলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ্য) ধ্বনির অলঙ্কারস্বরূপ।** ২৩॥

শব্দশক্তির দ্বারা, অর্থশক্তির দ্বারা অথবা শব্দার্থের উভয়ের শক্তির দ্বারা আক্ষিপ্ত হইয়াও ব্যঙ্গ্য অর্থ পুনরায় যে কাব্যে সাক্ষাৎ উক্তির দ্বারা প্রকাশিত হয় সেই কাব্য অনুস্বানোপম ব্যঙ্গ্যধ্বনি হইতে পৃথক; তাহা অলঙ্কারই। অথবা অলক্ষ্যক্রম ধ্বনি সম্ভব হইলে তাহা তাদৃশ অন্য (ব্যঙ্গ্যাত্মক, লোকোত্তর) অলঙ্কার। সেই বিষয়ে শব্দশক্তির দ্বারা আক্ষিপ্ততার উদাহরণ—

"হে বৎসে, তুমি বিষাদে পতিত হইও না। ঊর্ধ্বগামী আবেগপূর্ণ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ কর। তোমার গুরুতর কম্পই বা কেন হইবে, বলহানিকর গাত্রসম্মর্দনেই বা কি প্রয়োজন? এই দিকে যাও।

ভয়প্রশমনচ্ছলে দেবতাদিগকে প্রত্যাখ্যান করিয়া সমুদ্র মন্থনপর্য্যাকুলিতা লক্ষ্মীকে যাঁহার কাছে অর্পণ করিয়াছিলেন তিনি তোমাদিগের পাপ দহন করুন।”

[ শ্লেষার্থ ঃ—বিষাদং—যিনি বিষ ভক্ষণ করেন, শিব; উরুজবং শ্বসনং—বেগবান্ অর্থাৎ বায়ু। ঊর্দ্ধপ্রবৃত্তং—অগ্নি। কম্পঃ—অপ্ বা জলের পতি অর্থাৎ বরুণ। কঃ—ব্রহ্মা। গুরুস্তে—তোমার গুরুজন। বলভিদা জৃম্ভিতেন—ঐশ্বর্য্যমত্ত ইন্দ্রকে বুঝাইতেছে। ]

অর্থশক্তির দ্বারা আক্ষিপ্ত যথা—

এখানে বৃদ্ধা মাতা শয়ন করেন, এখানে পরিণতবয়স্কদের অগ্রণী পিতা শয়ন করেন, গৃহকর্ম্ম সমাপনান্তে জলানয়নকারী দাসী শিথিলতনু হইয়া শয়ন করে এইখানে। আমার স্বামী কিছুকাল যাবৎ বিদেশ-গত হইয়াছেন। এই গৃহে পাপিষ্ঠা আমি একা শয়ন করি। অবসরজ্ঞাপনচ্ছলে তরুণী পথিককে এইরূপ বলিল।”

শব্দ ও অর্থ—উভয়ের শক্তির দ্বারা আক্ষিপ্তত্বের দৃষ্টান্ত, যেমন—“দৃষ্ট্যাকেশব” ইত্যাদি।

**অভ্যবস্তুর ব্যঞ্জক অর্থও দ্বিবিধ—যাহা প্রৌঢ়োক্তির দ্বারা নিষ্পন্ন হইয়াছে অথবা যাহা আপনা হইতেই সম্ভূত। ২৪॥**

অর্থশক্ত্যুদ্ভব অনুরণনরূপ ব্যঙ্গ্যধ্বনিতে যে অর্থ ব্যঞ্জক বলিয়া কথিত হইয়াছে তাহারও দুই প্রকার আছে। কবি অথবা কবিকল্পিত বক্তার প্রৌঢ়োক্তির দ্বারা যাহা নিষ্পন্ন হইয়াছে তাহা এক, যাহা আপনা হইতেই সম্ভূত হইয়াছে তাহা দ্বিতীয়। শুধু কবির প্রৌঢ়োক্তির দ্বারা নিষ্পন্ন হইয়াছে—ইহার উদাহরণ, যেমন—

“অনঙ্গের শরাগ্রের লক্ষ্য হইতেছে যুবতীরা; বসন্তকাল নবাম্রমুখ-বিশিষ্ট ও নূতনপল্লবশোভিত এই সকল শর কেবল সজ্জিত করিতেছে; এখনও তাহা অনঙ্গকে অর্পণ করিতেছে না।”

শুধু কবিকল্পিত বক্তার প্রৌঢ়োক্তির দ্বারাই যাহা নিষ্পন্ন হইয়াছে এইরূপ ধ্বনির উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে—'শিখরিণি' ইত্যাদিতে। অথবা যেমন—

"যৌবন সাদরে তাহার হস্ত প্রসারিত করিলে তোমার সমুন্নমিত স্তনযুগল উত্থিত হইয়া মদনের সেবা করিতেছে।"

যাহা আপনা হইতেই সম্ভূত—যাহা বাহিরের দিক্‌ দিয়াও ঔচিত্যের জন্য আপনা হইতেই সম্ভব, কেবল উক্তির বৈচিত্র্যের দ্বারাই যাহার শরীর গঠিত হয় নাই। যেমন 'এবংবাদিনি' ইত্যাদিতে উদাহৃত হইয়াছে। অথবা যেমন—

"যে সকল সপত্নীরা মুক্তাফলের দ্বারা প্রসাধন রচনা করিয়াছিল ব্যাধপত্নী ময়ূরপুচ্ছ কর্ণে পুরিয়া সগর্ব্বে তাহাদের মধ্যে ভ্রমণ করিতে লাগিল।"

**যেখানে অর্থশক্তি হইতে অন্য অলঙ্কারও প্রতীত হয় সেই কাব্য অনুস্বানোপমব্যঙ্গ্যনামক অপর এক প্রকার। ২৬ ॥**

যেখানে বাচ্যালঙ্কার ব্যতিরিক্ত অন্য অলঙ্কার অর্থসামর্থ্য হইতে প্রতীয়মান হইয়া অবভাসিত হয় তাহা অর্থশক্ত্যুদ্ভব অনুস্বানোপমব্যঙ্গ্যনামক অন্য ধ্বনি ( বস্তুধ্বনি হইতে পৃথক অলঙ্কারধ্বনি )। এই ধ্বনির বিষয় খুব বিরল হইতে পারে এই আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন—

**রূপকাদি অলঙ্কারবর্গ যাহা বাচ্যকে আশ্রয় করে তাহারা সবাই ব্যঙ্গ্যভাব গ্রহণ করে—ইহার বহুল প্রয়োগ প্রদর্শিত হইয়াছে। ২৬ ॥**

রূপকাদি অলঙ্কার অন্য লেখকের রচনায় বাচ্য হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। কিন্তু সেইখানেও পূজনীয় ভট্ট উদ্ভট প্রভৃতি লেখকগণ তাহার প্রতীয়মানস্বরূপত্বের বহুল প্রয়োগ দেখাইয়াছেন। তাহা হইলে দাঁড়াইল এই যে সন্দেহাদি অলঙ্কারে উপমা, রূপক ও

অতিশয়োক্তি অলঙ্কারের প্রকাশমানত্ব দেখান হইয়াছে। সুতরাং অলঙ্কারবিশেষের অন্য অলঙ্কারবিশেষবিষয়ে যে ব্যঙ্গ্যত্ব থাকে তাহা যত্ন করিয়া প্রতিপাদন করিতে হইবে না। কিন্তু তবুও ইহা পুনরায় বলা হইতেছে—

**যে কাব্যে বাচ্যাতিরিক্ত অন্য অলঙ্কারের প্রতীতি হইলেও বাচ্য অর্থের ব্যঙ্গ্যাধীনত্ব প্রকাশিত হয় না তাহা ধ্বনির মার্গ নহে। ২৭॥**

অন্য অলঙ্কারে অনুরণনরূপ অলঙ্কারের প্রতীতি থাকিলেও সেখানে ব্যঙ্গ্যের প্রতিপাদনের উন্মুখী হইয়াই বাচ্যের চারুত্ব ব্যবস্থাপিত হয় না তাহা ধ্বনির মার্গ নহে। তাই দীপকাদি অলঙ্কারে উপমা ব্যঙ্গ্য হইলেও চারুত্ব ব্যঙ্গ্যানুযায়ী হইয়া থাকে না, তাই তাহাকে ধ্বনি বলা যায় না। যেমন—

"চন্দ্রকিরণের দ্বারা নিশা, কমলের দ্বারা নলিনী, কুসুমগুচ্ছের দ্বারা লতা, হংসের দ্বারা শারদশোভা, সজ্জনের দ্বারা কাব্যকথা—গৌরব লাভ করে।"

এখানে উপমাগর্ভত্ব থাকিলেও বাচ্যালঙ্কারের দ্বারাই চারুত্বের প্রতীতি হইতেছে—ব্যঙ্গ্যালঙ্কারের তাৎপর্য্যের দ্বারা নহে। সুতরাং সেইখানে কাব্য বাচ্যালঙ্কারাশ্রয়ী এইরূপ ব্যপদেশই করা উচিত। কিন্তু যেখানে ব্যঙ্গ্যের অধীন হইয়াই বাচ্য ব্যবস্থাপিত হইয়াছে সেইখানে ব্যঙ্গ্যমার্গেই কাব্যত্ব লাভ হইতেছে এইরূপ ব্যপদেশ যুক্তিযুক্ত। যেমন—

"প্রাপ্তশ্রী এই রাজা কেন আমার উপরে আবার: মন্থনপীড়া নিক্ষেপ করিবেন? এই অনলসচিত্ত রাজা পূর্ব্বে নিদ্রিত ছিলেন এইরূপ সম্ভাবনাও করিতে পারিনা। সকল দ্বীপের রাজারা ইহার অনুগামী; ইনি কেন পুনরায় আমার উপরে সেতু নির্ম্মাণ করিবেন?—হে রাজন্,

আপনি সমুদ্রের সম্মুখে আসিলে এই সকল বিতর্কের ফলে যেন তাহার কম্প উপস্থিত হয়।”

অথবা যেমন মৎপ্রণীত নিম্নলিখিত শ্লোকেই—

“হে তরলায়তলোচনে, তোমার ঈষৎ হাস্যময় মুখের লাবণ্যশোভায় এখন চতুর্দ্দিক পরিপূরিত হইয়াছে। এই মুখের প্রভাবে, যদি পয়োধির অল্প ক্ষোভসঞ্চারও না হয় তাহা হইলে মনে হয় যে জলরাশি ( জাড্যসঞ্চয় ) সুপ্রকাশিতই হইয়াছে।” ( জল—জড় )

এবংবিধ বিষয়ে অনুরণনরূপ রূপকাশ্রয়ে কাব্যের চারুত্ব ব্যবস্থিত থাকায় ইহা রূপকধ্বনি এইরূপ নামকরণ যুক্তিসঙ্গত।

উপমাধ্বনি যেমন—

“বীরের দৃষ্টি প্রিয়ার কুঙ্কুমারুণ স্তনতটে তত আনন্দ পায় না যত আনন্দ পায় শত্রুর বহুসিন্দুরবিশিষ্ট গজকুম্ভস্থলে।”

অথবা যেমন মদীয় বিষমবাণলীলাকাব্যে অসুরপরাক্রমপ্রসঙ্গে কামদেবের বর্ণনায়—

“তাহাদের যে হৃদয় লক্ষ্মীসহোদররূপ রত্নের আহরণে একাগ্র থাকে তাহাই পুষ্পধন্বা কর্ত্তৃক প্রিয়াদের বিম্বাধরে সন্নিবেশিত হইল।”

আক্ষেপধ্বনি যেমন—

“হয়গ্রীবের অনন্তগুণ সেই বলিতে পারে যে জলকুম্ভের দ্বারা সমুদ্রের সীমা জানিতে পারে।”

হয়গ্রীবের গুণসমূহের অবর্ণনীয়তা এবং তদ্দ্বারা সেই গুণাবলীর অনন্যসাধারণত্ব-বর্ণন আক্ষেপ-অলঙ্কারের বিষয়; এখানে সেই আক্ষেপ-অলঙ্কার প্রকাশিত হইতেছে অতিশয়োক্তি দ্বারা।

অর্থান্তরন্যাসধ্বনি দুই প্রকারের হইতে পারে—শব্দশক্তিমূলক অনুরণনরূপ ব্যঙ্গ্য আর অর্থশক্তিমূলক অনুরণনরূপ ব্যঙ্গ্য। সেইখানে প্রথমটির উদাহরণ—

"ফল যখন দৈবায়ত্ত তখন কি করা যাইতে পারে? কিন্তু আমরা এইমাত্র বলিতে পারি। যে রক্তাশোকের পল্লবসমূহ অন্য পল্লবের মত নহে।"

এই অর্থান্তরন্যাসধ্বনি একটি পদকে আশ্রয় করিয়া আছে; কিন্তু সমগ্র বাক্যে অন্য অর্থের তাৎপর্য্য রহিয়াছে। ইহা সত্ত্বেও কোন বিরোধ নাই।

"আমার ক্রোধ হৃদয়ে নিহিত ছিল; মুখে তাহার কোন চিহ্ন ছিল না। তবু তুমি আমাকে প্রসন্ন করিয়াছ। হে বহুজ্ঞ, তুমি অপরাধ করিয়াছ, তবু তোমার উপর রাগ করা যায় না।"

বহুজ্ঞ ব্যক্তি অপরাধ করিয়া থাকিলেও তাহার উপরে রাগ করা সম্ভব নহে—এই সাধারণাত্মক অর্থ বাচ্যবিশেষের সঙ্গে অন্বিত হইয়া তাহারই সমর্থকরূপে অথচ বাচ্যাতিরিক্ত হইয়া প্রকাশ পাইতেছে।

ব্যতিরেক-ধ্বনিরও উভয়রূপ হইতে পারে। তাহার প্রথমরূপের উদাহরণ পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে। দ্বিতীয়ের উদাহরণ, যেমন—

"বরং বনের একান্তে কুব্জ গলিতপত্র পাদপ হইয়া যেন জন্মগ্রহণ করি। কিন্তু মনুষ্যপরিপূর্ণ মর্ত্ত্যভবনে যেন ত্যাগগতপ্রাণ ও দরিদ্র হইয়া না জন্মিতে হয়।"

এইখানে ত্যাগগত দরিদ্রের জন্মের অনভিনন্দন এবং গলিতপত্র কুব্জ-পাদপের জন্মের অভিনন্দন সাক্ষাৎভাবে শব্দের দ্বারা বাচ্য হইয়াছে। সেইরূপ পাদপ ও তাদৃশ পুরুষের মধ্যে উপমান-উপমেয়ে ভাবের আধিক্য প্রতীতি জন্মে; পুরুষের অবস্থা শোচনীয় হওয়ায় তৎপরে উপমেয়ের আধিক্য ব্যঞ্জনার দ্বারা প্রকাশিত হয়।

উৎপ্রেক্ষাধ্বনি যেমন—

"বসন্তকালে চন্দনবৃক্ষে আসক্ত সর্পের নিঃশ্বাসবায়ুর দ্বারা উপচিত (মূর্চ্ছিত) এই মলয়মারুত পথিকদিগের মূর্চ্ছা আনয়ন করে।"

এইখানে বসন্তের মলয়মারুত পথিকের যে মূর্চ্ছা আনয়ন করে তাহা কামোন্মত্ততা আনয়ন করিবার জন্যই। কিন্তু বায়ুর এই পথিক-মূর্চ্ছাকারিত্ব উৎপ্রেক্ষিত হইতেছে, কারণ চন্দনাসক্ত সর্পের নিঃশ্বাস-বায়ুর দ্বারা সে নিজে মূর্চ্ছিত হইয়াছে। এই উৎপ্রেক্ষা সাক্ষাৎভাবে কথিত না হইলেও বাক্যার্থের সামর্থ্যবশতঃ অনুরণনবিশিষ্ট হইয়া লক্ষিত হইতেছে। এই সকল বিষয়ে 'ইব' প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগ না হইলেও অসংবদ্ধতা হইয়াছে এইরূপ বলা যায় না। কারণ অর্থের অববোধনশক্তির জন্য 'ইব' প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগ করা না হইলেও উৎপ্রেক্ষিত অর্থের অবগতি হয় এইরূপ অন্যত্রও দেখা যায়। যেমন—

"তোমার মুখ ঈর্ষ্যাকলুষিত হইলেও এই পূর্ণিমাচন্দ্র কিন্তু তাহার সাদৃশ্য লাভ করিয়া নিজের অঙ্গের মধ্যে নিজেকে ধরিয়া রাখিতে পারিতেছে না।"

অথবা যেমন—

"ভয়ব্যাকুল মৃগ গৃহের চতুর্দ্দিকে ধাবিত হইলে কোন ধনুর্দ্ধারী পুরুষই তাহার অনুসরণ করিল না। কিন্তু মৃগ কোথাও স্থির হইয়া রহিল না; কারণ আকর্ণবিস্তৃত নয়নবাণের দ্বারা অঙ্গনারা তাহার দৃষ্টির শোভা বিনষ্ট করিতেছিল।

শব্দ ও অর্থের ব্যবহারে প্রসিদ্ধিই প্রমাণ।

শ্লেষধ্বনির উদাহরণ—

'যেখানে বলভী সুরম্য বলিয়া পতাকা লাভ করিয়াছে এবং নির্জ্জন বলিয়া অনুরাগের বর্দ্ধন করে। এই নম্রবলিকাযুক্ত বলভীদিগের সহিত বধূদিগকে তরুণেরা উপভোগ করিত।'

[ শ্লেষার্থ :—যেখানে সুরম্য বলিয়া প্রসিদ্ধ, সুশ্লিষ্ট অঙ্গশালিনী বলিয়া অনুরাগবর্দ্ধনকারিণী এবং ত্রিবলিযুক্ত রমণীদিগকে তরুণেরা উপভোগ করিত। ]

বধূদের সহিত বলভীদিগকে উপভোগ করিত—এখানে এই বাক্যার্থের প্রতীতির পরে বধূদের মতই বলভীগুলি এই শ্লেষপ্রতীতি শব্দের দ্বারা কথিত না হইলেও অর্থের সামর্থ্যের জন্য মুখ্য হইয়া বর্ত্তমান রহিয়াছে।

যথাসংখ্য-অলঙ্কার ধ্বনি, যেমন—

"সহকারবৃক্ষ অঙ্কুরিত, পল্লবিত, কোরকিত ও পুষ্পিত হইয়াছে। হৃদয়েও মদন অঙ্কুরিত, পল্লবিত, কোরকিত ও পুষ্পিত হইয়াছে।"

পূর্ব্ব দুই পাদকে লক্ষ্য করিয়া পরবর্ত্তী দুই পাদে অঙ্কুরিতাদিশব্দ মদনের বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হওয়ায় সেইখানে অনুরণনাত্মক ব্যঙ্গ্যের সৃষ্টি হইয়াছে এবং তদ্দ্বারা যে চারুত্বের প্রতীতি হইতেছে তাহা মদন ও সহকারে তুল্যরূপে সংযুক্ত হওয়ায় বাচ্য হইতে অতিরিক্তরূপে পরিলক্ষিত হয়। এইরূপে অন্যান্য অলঙ্কারগুলি যেখানে যেরূপ সন্নিবেশ করা উচিত সেইভাবে সন্নিবেশ করিতে হইবে।

এইভাবে অলঙ্কারধ্বনিমার্গের ব্যুৎপাদন করিয়া তাহার প্রয়োজনীয়তা খ্যাপন করিবার উদ্দেশ্যে ইহা বলা হইতেছে—

**বাচ্যত্ব অবস্থায় যে সকল অলঙ্কার শরীরত্বই লাভ করিতে পারে না তাহারা ধ্বনির অঙ্গ হইয়া পরম কান্তি লাভ করে। ২৮॥**

ব্যঞ্জকত্ব এবং ব্যঙ্গ্যত্ব—এই উভয়ভাবেই ধ্বনির অঙ্গ হওয়া যায়। এখানে প্রসঙ্গ স্মরণ রাখিলে ব্যঙ্গ্যত্বের দ্বারা যে ধ্বনির অঙ্গতা লাভ করা যায় তাহাই ধরিতে হইবে। অলঙ্কারসমূহ ব্যঙ্গ্য হইলে যদি সেই ব্যঙ্গ্যের প্রাধান্য বিবক্ষিত হয় তাহা হইলে তাহা ধ্বনির অন্তর্ভূত হয়। অন্যথা গুণীভূতব্যঙ্গ্যত্ব হইবে—ইহা পরে প্রতিপাদন করিব। ব্যঙ্গ্যত্ব অবস্থায়ও অঙ্গিরূপে সন্নিবেশিত অলঙ্কারসমূহের

দুই গতি দেখা যায়—কদাচিৎ বস্তুমাত্রের দ্বারা অভিব্যক্তি হয়, কদাচিৎ অলঙ্কারের দ্বারা। সেইখানে—

**যখন বস্তুমাত্রের দ্বারা অলঙ্কারসমূহ ব্যঞ্জিত হয়, তখন তাহারা ধ্বনির অঙ্গতা লাভ করে।**

ইহার কারণ—

**কবিব্যাপার অলঙ্কারকে আশ্রয় করে। ২৯॥**

যেহেতু তথাবিধ ব্যঙ্গ্য অলঙ্কারকে আশ্রয় করিয়াই সেইখানে কবিব্যাপার প্রবৃত্ত হইয়াছে। নচেৎ তাহা (কাব্য) বাক্যমাত্রে পর্য্যবসিত হইবে।

সেই অলঙ্কারসমূহ—

**অন্য অলঙ্কারের দ্বারা ব্যঞ্জিত হইলে**

আবার

**ধ্বনির অঙ্গত্ব লাভ করিবে, অবশ্য যদি চারুত্বের উৎকর্ষের জন্যই ব্যঙ্গ্যের প্রাধান্য লক্ষিত হয়।** ৩০॥

এইরূপ কথিতই হইয়াছে—"বাচ্য ও ব্যঙ্গ্যের মধ্যে কোন্‌টি প্রধান বলিয়া বিবক্ষিত হইয়াছে তাহা চারুত্বের উৎকর্ষ হইতেই নির্ণয় করা হয়। যেখানে অলঙ্কারসমূহ বস্তুমাত্রের দ্বারা ব্যঙ্গ্য হয়, সেইখানকার উদাহরণ সন্নিহিত প্রসঙ্গের উদাহরণ হইতে পরিকল্পনীয়। সুতরাং অর্থমাত্রের দ্বারা অথবা অলঙ্কারবিশেষরূপ অর্থের দ্বারা অন্য অর্থ বা অলঙ্কারের প্রকাশ হইলে এবং চারুত্বের উৎকর্ষের জন্য তাহার প্রাধান্য হইলে অর্থশক্ত্যুদ্ভব অনুরণনরূপ ব্যঙ্গ্যধ্বনি বুঝিতে হইবে।

এইভাবে ধ্বনির প্রভেদ প্রতিপাদন করিয়া তাহাদিগের সঙ্গে তাহাদের আভাসের বিভিন্নতা দেখাইবার উদ্দেশ্যে বলা হইতেছে—

**যেখানে প্রতীয়মান অর্থ অস্পষ্ট হইয়া অথবা বাচ্যের অঙ্গ হইয়াও প্রতিভাত হয় সেই কাব্য ধ্বনির বিষয় নহে। ৩১॥**

প্রতীয়মান অর্থ দুই প্রকারের—স্ফুট ও অস্ফুট। তন্মধ্যে যে স্ফুট অর্থ শব্দশক্তি বা অর্থশক্তির দ্বারা প্রকাশিত হয়, তাহা ধ্বনির মার্গ, অপরটি (অস্ফুট) নহে। যে প্রতীয়মান অর্থ স্ফুট হইয়াও বাচ্যের অঙ্গরূপে প্রতিভাত হয় তাহা এই অনুরণনরূপ ব্যঙ্গ্যধ্বনির বিষয় নহে।"

যেমন—

"সরোবর মলিন হয় নাই, হংসও সহসা উড়িয়া যাইতেছে না। কোন নিপুণ ব্যক্তি গ্রাম্য জলাশয়ে মেঘের চাঁদোয়া টাঙ্গাইয়া দিয়া তাহা বিস্তার করিয়া দিয়াছে।

এখানে মুগ্ধবধূর জলধরপ্রতিবিম্ব-দর্শন প্রতীয়মান অর্থ; তাহা বাচ্য অর্থেরই অঙ্গ হইয়াছে। যেখানে অন্যত্রও এবংবিধ বিষয়ে ব্যঙ্গ্যের উপরে নির্ভরশীল হইয়া বাচ্য অর্থের চারুত্বোৎকর্ষের প্রতীতি হয় এবং তাহারই প্রাধান্য সূচিত হয়, সেইখানে ব্যঙ্গ্যের অঙ্গত্ব প্রতীত হওয়ায় ধ্বনির বিষয় হয় না।

যেমন—

"বেতসলতাগহনে উড্ডীন পক্ষীর কোলাহল শুনিতে শুনিতে গৃহকর্ম্মে ব্যাপৃত ব্যাধবধূর অঙ্গসমূহ অবসন্ন হইতেছে।"

এবংবিধ বিষয় প্রায়ই গুণীভূতব্যঙ্গ্যের উদাহরণ হিসাবে নির্দ্দেশিত হইবে। কিন্তু যেখানে প্রকরণাদির প্রতীতির দ্বারা বাচ্য অর্থের বৈশিষ্ট্য নির্দ্ধারিত হওয়ার পর পুনরায় তাহা প্রতীয়মানের অঙ্গ হইয়া প্রতিভাত হয় সেই কাব্য এই অনুরণনরূপ ব্যঙ্গ্যধ্বনিরই মার্গ।

যেমন—

"হে হালিকপুত্রবধূ, ভূতলে পতিত কুসুম চয়ন কর। শেফালিকা-বৃক্ষকে কম্পিত করিও না। শ্বশুর তোমার বলয়শিঞ্জন শুনিতেছে; ইহার পরিণাম অশুভ।"

এখানে উপপতির সহিত রমণকারিণী নায়িকার বলয়শব্দ বাহিরে

শুনিতে পাইয়া সখী তাহাকে সতর্ক করিতেছে। বাচ্য অর্থের জ্ঞানের জন্যই এইটুকু ব্যঙ্গ্য অর্থের অপেক্ষা রাখিতে হইবে। বাচ্য অর্থ প্রতিপন্ন হইলে নায়িকার স্বভাবদোষকে গোপন করিবার উদ্দেশ্যমূলক তাৎপর্য্য থাকার জন্য পুনরায় ইহা ব্যঙ্গ্যের অঙ্গ হইয়াছে। তাই এই কাব্য অনুরণনরূপ ব্যঙ্গ্যের অন্তর্ভূত।

এইভাবে বিবক্ষিতবাচ্যধ্বনি ও তাহার আভাসের বিভাগ করার পর অবিবক্ষিতবাচ্যধ্বনিরও অনুরূপ বিভাগ করিবার জন্য বলিতেছেন—

**ব্যুৎপত্তি বা শক্তির অভাবনিবন্ধন শব্দের যে গৌণ ও লাক্ষণিক প্রয়োগ করা হয় পণ্ডিতগণ তাহাকে ধ্বনির বিষয় বলিয়া মনে করেন না। ৩২ ॥**

স্খলিতগতি শব্দের অর্থাৎ উপচরিত প্রয়োগবিশিষ্ট শব্দের ব্যুৎপত্তি বা শক্তির অভাবজনিত যে শব্দপ্রয়োগ তাহাও ধ্বনির বিষয় নহে। যেহেতু—

**এই সকল প্রভেদেই অঙ্গীভূত ব্যঙ্গ্যের যে স্ফুটরূপে প্রকাশ তাহাই পূর্ণ ধ্বনিলক্ষণ। ৩৩ ॥**

সেই ধ্বনিলক্ষণের বিষয় উদাহৃত হইয়াছে।

ইতি শ্রীরাজানক আনন্দবর্দ্ধনাচার্য্যবিরচিত ধ্বন্যালোকে দ্বিতীয় উদ্দ্যোত।

# তৃতীয় উদ্দ্যোত

এইভাবে ব্যঙ্গ্যানুসারে ধ্বনির প্রভেদসমেত স্বরূপ প্রদর্শন করা হইলে ব্যঞ্জকানুসারে তাহা প্রকাশিত হইতেছে—

**অবিবক্ষিতবাচ্যধ্বনি এবং তাহার প্রভেদগুলি পদ ও বাক্যের মধ্য দিয়া প্রকাশিত হয়। তদিতর অনুরণনরূপ-ব্যঙ্গ্যও তাহাই। ১ ॥**

অবিবক্ষিতবাচ্যধ্বনির অত্যন্ততিরস্কৃতবাচ্যনামক প্রভেদে পদের মধ্য দিয়া ধ্বনির প্রকাশনের উদাহরণ, যেমন মহর্ষি ব্যাসের—'এই সাতটি সম্পদের উদ্বোধক ( সমিধ্ )' অথবা যেমন কালিদাসের—

"তুমি সজ্জিত ( সন্নদ্ধ ) হইলে কে বিরহবিধুরা জায়াকে উপেক্ষা করিতে পারে?" অথবা "যাহাদের আকৃতি সুন্দর ( মধুর ) কি না তাহাদের ভূষণ হয়?" এই সকল উদাহরণে—'সমিধঃ', 'সন্নদ্ধে' ও 'মধুরাণাং' এই তিনটি পদ ব্যঞ্জকরূপেই রচিত হইয়াছে। অর্থান্তর-সংক্রমিত বাচ্য প্রভেদে এই পদপ্রকাশতার উদাহরণ, যেমন—"হে প্রিয়ে, রামের পক্ষে নিজের জীবনই প্রিয় হইয়াছে; সে প্রেমের সমুচিত কাজ করে নাই।" এখানে 'রামেণ' এই পদের বাচ্য অর্থ সাহসসর্ব্বস্বত্ব প্রভৃতি ব্যঙ্গ্য অর্থে সংক্রমিত হইয়াছে; তাই ইহা ব্যঞ্জক। অথবা যেমন—"এইভাবেই জনসমাজ তোমার কপোলের উপমাস্বরূপ চন্দ্রমণ্ডলের উল্লেখ করে; কিন্তু পারমার্থিক বিচারে দেখা যাইবে যে হতভাগ্য চন্দ্র চন্দ্রই।"

সেই অবিবক্ষিতবাচ্যধ্বনির অর্থান্তরসংক্রমিতবাচ্যপ্রভেদের বাক্যের দ্বারা প্রকাশনের উদাহরণ—

"কাল কাহারও কাহারও পক্ষে বিষময় হইয়া, কাহারও কাহারও পক্ষে অমৃতময় হইয়া, কাহারও কাহারও পক্ষে বিষ ও অমৃতে মিশ্রিত হইয়া অতিবাহিত হয়।"

এই যে বাক্য ইহাতে 'বিষ' ও 'অমৃত' শব্দ দুঃখ ও সুখ অর্থে সংক্রমিত হইয়া প্রযুক্ত হইয়াছে; তাই ইহা অর্থান্তরসংক্রমিতবাচ্যের বাক্যের দ্বারা প্রকাশনের উদাহরণ। বিবক্ষিতবাচ্যধ্বনির অনুরণনরূপ ব্যঙ্গ্য শব্দশক্ত্যুদ্ভব নামক প্রভেদে পদের দ্বারা প্রকাশনের উদাহরণ, যেমন—

"যদি দৈব আমার মত মূঢ় ( জড়ঃ ) ব্যক্তিকে প্রার্থীর বাঞ্ছা পূরণ করিবার জন্য সৃষ্টি না করিয়া থাকেন তাহা হইলে আমাকে পথিমধ্যে প্রসন্নজলবিশিষ্ট তড়াগ বা শীতল ( জড়ঃ ) কূপ করিয়া কেন সৃষ্টি করা হয় নাই ?"

এই যে বাক্য ইহাতে 'জড়ঃ'-শব্দ খেদ প্রকাশনের জন্য বক্তার সঙ্গে সমানাধিকরণতা লাভ করিয়া প্রযুক্ত হইয়াছে; আবার কূপের সঙ্গে ইহার সমানাধিকরণতা অনুরণনের দ্বারা নিজের শক্তি বলেই প্রতিপন্ন হইতেছে।

বিবক্ষিতবাচ্যের শব্দশক্তিমূলক অনুরণনরূপ ব্যঙ্গ্যের বাক্যের দ্বারা প্রকাশনের উদাহরণ, যেমন হর্ষচরিতে সিংহনাদবাক্যে—"এই মহাপ্রলয় সমুপস্থিত হইলে ধরণীধারণের জন্য তুমি শেষ স্বরূপ।"

এই যে বাক্য ইহা শব্দশক্তির অনুরণনরূপ অন্য অর্থ স্পষ্টই প্রকাশিত করিতেছে।

এই বিবক্ষিতবাচ্যধ্বনির যে প্রভেদে কবিপ্রৌঢ়োক্তির দ্বারা ধ্বনির শরীর নিষ্পন্ন হয় তাহার পদের দ্বারা প্রকাশনের উদাহরণ, যেমন হরিবিজয়ে—

"মধুমাসের শ্রীর আরম্ভে ( মুখে ) আম্রমঞ্জরী কর্ণপুরের ন্যায় শোভা পাইল, বসন্তোৎসবের সমারোহ বিস্তীর্ণ হইল, নিবিড় মধুর আমোদ

ব্যাপ্ত হইল। মধুমাসলক্ষ্মী নিজের মুখকে সমর্পণ না করিলেও কামদেব তাহা গ্রহণ করিলেন।"

এই যে বাক্য ইহাতে "অসমর্পিত হইলেও মধুমাসলক্ষ্মীর মুখ গৃহীত হইল" এই অংশে "অসমর্পিতমপি' এই নবোঢ়াবস্থাবাচক পদ অর্থশক্তির দ্বারা কামদেবের বলাৎকার প্রকাশ করিতেছে।

"সজ্জই সুরহিমাসো"—এই পূর্ব্বোদাহৃত শ্লোকে ইহারই বাক্যের দ্বারা প্রকাশনের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। এইখানে "সজ্জিত করিতেছে; কিন্তু অনঙ্গদেবকে অর্পণ করিতেছে না" এই যে বাক্যার্থ, যাহা শুধু কবিপ্রৌঢ়োক্তির দ্বারা নিষ্পন্ন হইয়াছে তাহা কামোন্মত্ততারূপ পীড়াদায়ক অবস্থার সৃষ্টি করে।

যে অর্থশক্ত্যুদ্ভব প্রভেদে ধ্বনি স্বতঃসম্ভবী তাহার পদের দ্বারা প্রকাশিত হওয়ার দৃষ্টান্ত—

"হে বণিক্, আমরা হস্তিদন্ত ও ব্যাঘ্রচর্ম্ম কোথা হইতে পাইব? আমাদের গৃহে পুত্রবধূ যে তাহার চূর্ণকুন্তল মুখে ইতস্ততঃ বিকীর্ণ করিয়া পরিক্রমণ করিয়া বেড়ায়।"

এখানে 'লুলিতালকমুখী'—এই পদটি নিজশক্তিবলে ব্যাধবধূর স্বাভাবিক দেহসজ্জাকে সূচিত করিয়া তৎসঙ্গে সুরতশক্তিকে সূচিত করিতেছে এবং তাহার পর ইহাও সূচিত করিতেছে যে তাহার ভর্ত্তা সতত সম্ভোগের জন্য কৃশ হইতেছে।

তাহারই বাক্যপ্রকাশনের উদাহরণ, যেমন—

"যে সকল সপত্নী মুক্তাফলের দ্বারা প্রসাধন রচনা করিয়াছিল ব্যাধপত্নী ময়ূরপুচ্ছ কর্ণে পুরিয়া সগর্ব্বে তাহাদের মধ্যে ভ্রমণ করিতে লাগিল।"

এই বাক্যের দ্বারা শিখিপুচ্ছের কর্ণপূরপরিহিত কোন নবপরিণীত ব্যাধবধূর সৌভাগ্যাতিশয্য প্রকাশিত হইতেছে। কারণ একাগ্রমনে

তাহার সম্ভোগে অভিনিবেশ করার পর পতি শুধু ময়ূর বধ করিতে পারে এই অবস্থায় উপনীত হইয়াছে। পূর্ব্বে সপত্নীদের সম্ভোগ করিবার সময় সেই ব্যাধই হস্তী বধ করিতে সমর্থ ছিল। তাহা হইতে যে সকল মুক্তাফল পাওয়া যাইত তদ্দ্বারা অন্য বধূরা যে প্রসাধন রচনা করিয়াছে তাহা তাহাদের দুর্ভাগ্যের আতিশয্যই খ্যাপন করিতেছে।

প্রশ্ন হইতে পারে, পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে ধ্বনি কাব্যেরই বৈশিষ্ট্য; তবে কেমন করিয়া তাহা পদের মধ্য দিয়া প্রকাশিত হইবে? কাব্যের বিশিষ্ট লক্ষণ এই যে তাহা বিশিষ্ট অর্থবোধক শব্দসন্দর্ভবিশেষ। যদি ইহা পদের দ্বারা প্রকাশিত হয় তাহা হইলে সেই ভাবটি উপপন্ন হয় না; যেহেতু পদসমূহ (অর্থের) স্মারক, তাহাদের বাচকশক্তি নাই। তদুত্তরে বলা হইয়াছে—যদি বাচকত্বকে ধ্বনিব্যবহারের প্রযোজক বলিয়া মনে করা যায়, তাহা হইলে এই দোষ হইবে। কিন্তু এইরূপ হয় না। কারণ বাচক ব্যঞ্জকরূপে ব্যবস্থাপিত হইয়াছে, প্রয়োজক হিসাবে নহে। অপিচ, শরীরের সৌন্দর্য্যবিষয়ক প্রতীতি যেমন অবয়বসংস্থানসঙ্গে ওতঃপ্রোতঃ ভাবে সম্পর্কিত সমগ্রের দ্বারা সাধিত হয়, সেইরূপ কাব্যেরও। কিন্তু শরীর সম্পর্কেও অন্বয়ব্যতিরেকের দ্বারা চারুত্ব কোন বিশেষ অঙ্গে পরিকল্পিত হয়, সেইরূপ ব্যঞ্জকত্বমার্গে পদের সম্পর্কে ধ্বনির প্রয়োগ হইলে বিরোধিতা হয় না।

"শ্রুতিকটু পদে অভিব্যক্ত অনভিপ্রেত অর্থের স্মারক শব্দের শ্রুতি যেমন দোষ আনয়ন করে, তেমন যাহা অভীপ্সিত তাহার স্মৃতি গুণের সৃষ্টি করে। সেইজন্য যদিও পদসমূহ স্মারকমাত্র, তবু ধ্বনি শুধু পদের দ্বারাই প্রকাশিত হয় এবং তাহার সকল প্রভেদেই সৌন্দর্য্য আছে। বিচিত্র শোভাশালী একটি অলঙ্কারের দ্বারাই যেমন কামিনী দীপ্তিলাভ করে সেইরূপ পদপ্রকাশিত ধ্বনির দ্বারা সুকবির বাণী উজ্জ্বলতা লাভ করে।"

এই সংগ্রহ-শ্লোকসমূহ সন্নিবিষ্ট হইল।

**যাহাকে অলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ্যধ্বনি বলা হয়, তাহা যেমন বর্ণ, পদ, বাক্য ও সংঘটনায় প্রকাশ পায় সেইরূপ প্রবন্ধেও প্রকাশ পায়। ২॥**

সেইখানে বর্ণের ব্যঞ্জকত্ব অসম্ভব, কারণ বর্ণের কোন অর্থ নাই—এইরূপ আপত্তি আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন—

**শ, ষ, রেফ সংযোগ, চ-কার—শৃঙ্গারে ইহাদের বহুল প্রয়োগ রসপরিপন্থী হয়। কারণ তাহার দ্বারা বর্ণসমূহ রস হইতে বিচ্যুত হয়। ৩॥**

**তাহারাই যখন বীভৎসাদিরসে সন্নিবেশিত হয় তখন তাহারা রসকে দীপ্তই করে, কারণ তাহার দ্বারা রসধারা ক্ষরিত হয়। ৪॥**

এই দুইটি শ্লোকের দ্বারা অন্বয়-ব্যতিরেকের সাহায্যে বর্ণসমূহের দ্যোতকত্ব দেখান হইল।

পদের মধ্যে অলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ্যধ্বনির প্রকাশের উদাহরণ, যেমন—"হে প্রেয়সি, তুমি উৎকম্পিত হইয়াছিলে, ভয়ে তোমার বসনাঞ্চল স্খলিত হইয়াছিল, তোমার সেই কাতর লোচন দুইটি প্রতি দিকে নিক্ষেপ করিয়াছিলে; ক্রুর অগ্নি বিচার না করিয়া তোমাকে দগ্ধ করিয়াছিল; ধূমের দ্বারা আমার দৃষ্টি নষ্ট হইয়া গিয়াছিল বলিয়া আমি তোমাকে দেখিতে পাই নাই।"

এই যে শ্লোক ইহার মধ্যে 'তে'-পদ সহৃদয় ব্যক্তিদের কাছে রসময়রূপে প্রতিভাত হয়।

পদের অবয়বের দ্বারা দ্যোতনের উদাহরণ, যেমন—

"গুরুজনদের কাছে লজ্জার জন্য সে নতমুখী হইয়া বসিয়া ছিল। স্তনকুম্ভদ্বয়ের উৎকম্পসমন্বিত শোক হৃদয়ে নিগৃহীত করিয়া সে

অশ্রুত্যাগ করিয়া আমার প্রতি চকিতহরিণীর মত মনোহারী নয়নের দৃষ্টি বহুলপরিমাণে (ত্রিভাগ) আসক্ত করিয়া কি বলে নাই, 'তুমি থাকিয়া যাও'?

এখানে 'ত্রিভাগ' শব্দ।

বাক্যরূপ অলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ্যধ্বনি দুই প্রকারের হইতে পারে এইরূপ সিদ্ধান্ত করা যায়—বিশুদ্ধ এবং অলঙ্কারের সহিত সম্মিশ্র।

সেইখানে 'বিশুদ্ধ' প্রকারের উদাহরণ, যেমন রামাভ্যুদয়ে "কৃতককুপিতৈঃ" ইত্যাদি শ্লোক। এই যে বাক্য ইহা পরিপুষ্টিপ্রাপ্ত পরস্পরানুরাগ প্রদর্শন করিয়া অতি চমৎকার রসতত্ত্ব প্রকাশ করিতেছে।

অন্য অলঙ্কারের দ্বারা সম্মিশ্রণের উদাহরণ, যেমন—"স্মরনবনদীপুরেণোঢ়াঃ" ইত্যাদি শ্লোক। যে ব্যঞ্জকের লক্ষণের কথা বলা হইয়াছে রূপক অলঙ্কার এইখানে তাহার অনুগামী হইয়া রসকে প্রসাধিত করিয়াছে বলিয়া রস অতিশয়িত অভিব্যক্তি পাইতেছে।

অলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ্যধ্বনি সংঘটনায় প্রতিভাত হয়—ইহা বলা হইয়াছে। সেইখানে সংঘটনার স্বরূপ এইভাবে নিরূপণ করা হইতেছে—

**সংঘটনা তিনরকমের বলিয়া কথিত হইয়াছে—যেখানে সমাস নাই, যেখানে মধ্যমরকমের সমাস ভূষণ হইয়াছে এবং যেখানে দীর্ঘ সমাস আছে। ৫॥**

সংঘটনার সেই সংজ্ঞার সমর্থন করিয়া ইহা বলা হইতেছে—

**তাহা মাধুর্য্যাদি গুণসমূহকে আশ্রয় করিয়া থাকে এবং রসগুলিকে প্রকাশ করে।**

তাহা অর্থাৎ সংঘটনা গুণসমূহকে আশ্রয় করিয়া রসগুলিকে প্রকাশ করে। এখানে ভাগ করিয়া বিচার করিয়া দেখিতে হইবে গুণসমূহ ও সংঘটনা—ইহারা কি একই পদার্থ না পৃথক্। যদি ইহাদের মধ্যে পার্থক্যই থাকে তাহা হইলেও দুই প্রকারের ব্যবস্থা হইতে পারে—

গুণকে আশ্রয় করিয়া সংঘটনা থাকিতে পারে অথবা সংঘটনাকে আশ্রয় করিয়া গুণগুলি থাকিতে পারে। ইহারা যখন একই হয় এবং যদি সংঘটনাকে আশ্রয় করিয়া গুণ থাকে তাহা হইলে যে গুণসমূহ সংঘটনার সঙ্গে একাত্মভূত অথবা তাহার আধেয় তাহাদিগকে আশ্রয় করিয়া থাকিয়া সে রসাদি প্রকাশ করে ইহাই অর্থ। ইহারা বিভিন্ন বলিয়া যে দুই পক্ষ কল্পনা করা হইয়াছে তন্মধ্যে যদি সংঘটনা গুণ আশ্রয় করিয়া থাকে এই পক্ষ গ্রহণ করিলে বুঝিতে হইবে যে সংঘটনা গুণের অধীন, ইহা গুণরূপী নহে। আচ্ছা, এইরূপ বিভাগ করিয়া দেখার প্রয়োজন কি? উত্তরে বলা হইতেছে—যদি গুণ ও সংঘটনা—ইহারা একই হয় অথবা সংঘটনাকে আশ্রয় করিয়া গুণসমূহ থাকে, তাহা হইলে সংঘটনার যেমন কোন বিষয়ের ঔচিত্য নাই, গুণেরও সেইরূপ হইত। গুণসমূহের সম্পর্কে কিন্তু দেখা যায় যে মাধুর্য্য ও প্রসাদগুণের বিষয় হইতেছে করুণ ও বিপ্রলম্ভশৃঙ্গার রস। ওজোগুণের বিষয় রহিয়াছে রৌদ্র ও অদ্ভুতাদিতে। মাধুর্য্য ও প্রসাদের বিষয়ই—রস ভাব ও তাহাদের আভাস। এইভাবে গুণের বিষয়ের নিশ্চিত নিয়ম রহিয়াছে; কিন্তু সংঘটনায় তাহার ব্যত্যয় হয়। তাই শৃঙ্গার রসেও দীর্ঘসমাসযুক্ত সংঘটনা দেখা যায় আবার রৌদ্রাদিতেও সমাসবিহীন সংঘটনা দেখা যায়।

শৃঙ্গারে দীর্ঘসমাসযুক্ত সংঘটনার উদাহরণ, যেমন—মন্দারকুসুমরেণুপিঞ্জরিতালকা ইতি। অথবা যেমন—

"হে অবলে, তোমার অনবরত নয়নজলকণানিপতনপরিমার্জ্জিতকপোলপত্রলেখ এই করতলনিষণ্ণবদন কাহাকে না সন্তপ্ত করে?" ইত্যাদিতে।

সেইভাবে রৌদ্রাদিতেও সমাসহীন সংঘটনা দেখা যায়। যেমন—"যো যঃ শস্ত্রং বিভর্ত্তি" ইত্যাদিতে। সুতরাং গুণসমূহ সংঘটনাস্বরূপও

নহে, সংঘটনাকে আশ্রয় করিয়াও থাকে না। প্রশ্ন হইতে পারে—যদি সংঘটনা গুণসমূহের আশ্রয় না হয়, তাহা হইলে কোন্ আশ্রয়কে অবলম্বন করিয়া ইহারা পরিকল্পিত হয়? উত্তরে বলা যাইতে পারে যে ইহাদের যে কি আলম্বন তাহা পূর্ব্বেই প্রতিপন্ন করা হইয়াছে—

"সেই অঙ্গী অর্থকে যাহারা অবলম্বন করিয়া থাকে তাহারা গুণ বলিয়া পরিচিত। অঙ্গকে যাহারা কটকাদির মত আশ্রয় করিয়া থাকে তাহাদিগকে অলঙ্কার বলিয়া মনে রাখিতে হইবে।" ( ২।৬ )

অথবা মানিয়া লইলাম যে গুণসমূহ শব্দকে আশ্রয় করিয়া থাকে, কিন্তু ইহারা তো অনুপ্রাসাদির তুল্য নহে; কারণ ইহা প্রতিপন্ন করাই হইয়াছে যে অনুপ্রাসাদি সেই সমস্ত শব্দের ধর্ম্ম যাহারা অর্থের অপেক্ষা রাখে না। গুণসমূহ সেই সমস্ত শব্দের ধর্ম্ম যাহারা ব্যঙ্গ্যবিশেষের অপেক্ষা রাখিয়া বাচ্যকে প্রতিপন্ন করিতে পারে। গুণসমূহ অন্য বস্তুকে আশ্রয় করিলেও ইহাদের শব্দধর্ম্মত্ব থাকিতে পারে; যেমন মানুষের শৌর্য্যাদিগুণ অন্যাশ্রয়ী হইলেও বলা যাইতে পারে তাহারা শরীরকে আশ্রয় করিয়া আছে।

আপত্তি হইতে পারে যে যদি গুণসমূহ শব্দাশ্রিতই হয় তাহা হইলে ইহা প্রমাণিত হয় যে তাহারা সংঘটনার সঙ্গে একাত্ম অথবা তাহারা সংঘটনাকে আশ্রয় করে। গুণগুলি অর্থবিশেষের দ্বারা প্রতিপাদ্য রসাদিকে আশ্রয় করিয়া থাকে। অতএব সংঘটনাশূন্য শব্দের বাচকত্ব নাই বলিয়া তাহারা গুণের আশ্রয় হইতে পারে না। কিন্তু এই যুক্তি ঠিক নহে, কারণ রস যে বর্ণ ও পদের দ্বারা ব্যক্ত হইতে পারে তাহা প্রতিপন্ন করা হইয়া গিয়াছে। রসাদি বাক্যের দ্বারা ব্যঙ্গ্য হয়, ইহা স্বীকার করিয়া লইলেও কোন সংঘটনা তাহাদের নিশ্চিত আশ্রয় হইতে পারে না; ব্যঙ্গ্যবৈশিষ্ট্যের অনুগামী হইয়া নিশ্চিত সংঘটনাশূন্য শব্দগুলিই গুণদিগের আশ্রয় হয়। আপত্তি হইতে পারে, মাধুর্য্য সম্পর্কে যদি এই কথা বলিতে

চাহেন, তবে বলুন, কিন্তু যে শব্দসংঘটনা নিয়মনিয়ন্ত্রিত নহে ওজোগুণ কেমন করিয়া আবার তাহার আশ্রয় হইবে? সমাসহীন সংঘটনা কখনও ওজোগুণকে আশ্রয় করে এইরূপ প্রতিপন্ন হয় না। কথিত হইতেছে—যদি প্রসিদ্ধি মাত্রে অভিনিবেশের দ্বারা আপনাদের চিত্ত দূষিত না হইয়া থাকে, তাহা হইলে এইখানেও যে হয় না তাহা বলা যায় না। সমাসহীন সংঘটনা কেন ওজোগুণের আশ্রয় হইবে না? যেহেতু পূর্ব্বেই প্রতিপাদন করা হইয়াছে যে যে-কাব্য রৌদ্রাদি রসকে প্রকাশ করে তাহার দীপ্তিকেই ওজোগুণ বলে। সেই ওজোগুণ যদি সমাসহীন সংঘটনায় থাকে, তবে কি দোষ হইবে? সহৃদয় ব্যক্তির হৃদয় অনুভব করিতে পারে এমন কোন অচারুত্ব সেইখানে থাকে না। সুতরাং যে শব্দসংঘটনায় কোন নিশ্চিত নিয়ম নাই, তাহা গুণসমূহের আশ্রয় হইলে কোন ক্ষতি নাই। সুতরাং যেমন চক্ষু প্রভৃতির যথাযোগ্য বিষয়নিয়ন্ত্রিতস্বরূপে কোন ব্যভিচার হয় না, গুণসমূহেরও সেইরূপ। আমরা একই যুক্তিতেই দেখিলাম যে গুণসমূহ ও সংঘটনা বিভিন্ন এবং গুণসংঘটনাকে আশ্রয় করে না অথবা গুণসমূহ সংঘটনার সঙ্গে একাত্মও নহে। "সংঘটনার ন্যায় গুণদিগেরও বিষয়ের কোন নিয়ম নাই, কারণ লক্ষ্য উদাহরণে নিয়মব্যতিক্রম দেখা যায়।" ইহা যে বলা হইয়াছে তাহার এইভাবে উত্তর দেওয়া যাইতে পারে—যদি লক্ষ্যবস্তুতে পরিকল্পিত বিষয়ের ব্যভিচার দেখা যায় তাহা হইলে সেই বিরুদ্ধ দৃষ্টান্ত বিরোধী হইয়াই থাক্। প্রশ্ন হইতে পারে সেইরূপ বিষয়ে সহৃদয় ব্যক্তিদের মনে অচারুত্বের প্রতীতি হয় না কেন? উত্তরে বলিব—কবির শক্তিবলে সেই বিরোধিতা তিরোহিত হইয়া গিয়াছে বলিয়া। দোষ দুই রকমের হইতে পারে—কবির অব্যুৎপত্তিজনিত ও তাঁহার শক্তির অভাবজনিত। কোন কোন স্থলে ব্যুৎপত্তির অভাবজনিত-দোষ কবিপ্রতিভার শক্তির দ্বারা আচ্ছাদিত হইয়া যায় বলিয়া তাহা লক্ষিত হয় না। যে দোষ কবির প্রতিভাশক্তির অভাবজনিত তাহা

অতি শীঘ্র প্রতীত হয়। এই বিষয়ে এই সংগ্রহশ্লোক দেওয়া যাইতে পারে—

"অব্যুৎপত্তিজনিত দোষ কবির প্রতিভার দ্বারা আবৃত হয়, কিন্তু যে দোষ প্রতিভাশক্তির অভাবজনিত তাহা শীঘ্র প্রকাশিত হয়।"

উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে উত্তম দেবতার সম্ভোগশৃঙ্গার বিষয়ে মহাকবিরা যে প্রসিদ্ধ নিবন্ধ রচনা করিয়াছেন তাহার অনৌচিত্য গ্রাম্য, অসভ্য বলিয়া প্রতীত হয় না, কারণ কবির শক্তির দ্বারা তাহা আচ্ছাদিত হইয়াছে। যেমন কুমারসম্ভবে পার্ব্বতীদেবীর সম্ভোগবর্ণনা। এই সকল বিষয়ে কেমন করিয়া ঔচিত্যমার্গ ত্যাগ করা না যায় তাহা কারিকাকার পরবর্ত্তী অংশে দেখাইয়াছেন। কেমন করিয়া কবির প্রতিভাশক্তির দ্বারা দোষ আচ্ছাদিত হয় তাহা অন্বয়ব্যতিরেকের দ্বারা নির্ণয় করা হয়। তদনুসারে বলা যাইতে পারে যে এবংবিধ বিষয়ে প্রতিভাশক্তিরহিত কোন কবি শৃঙ্গারমূলক কাব্য রচনা করিলে, দুষ্টতা স্ফুট হইয়াই প্রতিভাত হয়। এইরূপে গুণ ও সংঘটনার একাত্মতা স্বীকার করিলে প্রশ্ন করা যায়, "যো যঃ শস্ত্রং বিভর্ত্তি" ইত্যাদিতে কি চারুত্বের অভাব আছে? অচারুত্ব সেইখানে প্রতীয়মান হয় না বলিয়াই স্বীকার করিতে হইবে। সুতরাং গুণ হইতে সংঘটনাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিলে অথবা গুণের সঙ্গে তাহাকে একাত্ম করিয়া দেখিলে, উভয়পক্ষ অবলম্বন করিলেই অন্য কোন নিয়মহেতু বলিতে হইবে। তাই বলা হইতেছে—

**অতএব বক্তা ও বাচ্যের ঔচিত্যই তাহার নিয়ামক হেতু। ৬॥**

সেইখানে বক্তা কবি অথবা কবিকল্পিত পুরুষ; কবিকল্পিত বক্তা রসভাবরহিত হইতে পারে, রসভাবসমন্বিতও হইতে পারে। কথানায়ক ধীরোদাত্তাদিপ্রকারের লক্ষণযুক্ত হয়, প্রতিনায়কও ঐসকল

গুণান্বিত হইতে পারে। বাচ্য অর্থও ধ্বন্যাত্মক রসের অঙ্গ অথবা রসাভাসের অঙ্গ হইতে পারে; ইহা অভিনয়ের বিষয় হইতে পারে বা নাও হইতে পারে, উত্তমপ্রকৃতির নায়ককে আশ্রয় করিতে পারে, তদ্ভিন্ন অন্যপ্রকৃতির নায়ককেও আশ্রয় করিতে পারে—এইরূপ বহুপ্রকারের হইতে পারে। যখন কবি রসভাবরহিত হয়েন, তখন রচনায় যথেচ্ছাচার হইতে পারে। যখন কবিকল্পিত বক্তা রসভাবরহিত হয়, তখনও যথেচ্ছাচারই বিহিত। কিন্তু যখন কবি অথবা কবিকল্পিত বক্তা রসভাবসমন্বিত হয়, রসও প্রাধান্যের জন্য ধ্বনির আত্মভূত হয় তখন নিয়মানুসারেই সমাসহীন অথবা মধ্যমরকমের সমাসযুক্ত সংঘটনা হইবে। করুণ রস ও বিপ্রলম্ভশৃঙ্গার রসে সংঘটনা সমাসবিহীনই হইয়া থাকে। যদি প্রশ্ন হয়, কেন এইরূপ হইবে? তদুত্তরে বলা হইতেছে—রস যেখানে প্রধান ভাবে প্রতিপাদ্য সেইখানে তাহার প্রতীতিতে যে ব্যবধান বা বিরোধের সৃষ্টি হয় তাহা সর্ব্বথা পরিহার করিতে হইবে। এইভাবে বিচার করিলে দেখা যায় যে সমাসের বহুপ্রকারেব সম্ভাবনা থাকায় দীর্ঘ সমাসযুক্ত সংঘটন কখনও কখনও রসপ্রতীতিতে ব্যবধানেব সৃষ্টি করে। সুতরাং তাহার প্রতি অতিরিক্ত মনোযোগ শোভা পায় না, বিশেষতঃ অভিনেয় কাব্যে এবং তদ্ব্যতিরিক্ত কাব্যে, বিশেষ করিয়া করুণ ও বিপ্রলম্ভশৃঙ্গার রসের প্রকাশে। এই দুই রস অধিকতর সুকুমার বলিয়া অল্প অস্বচ্ছতা হইলেও প্রতীতি মন্থর হইয়া পড়ে। রৌদ্রাদি অন্য রস প্রতিপাদ্য হইলে মধ্যমরকমের সমাসযুক্ত সংঘটনা বিধেয়। কখনও কখনও ধীরোদ্ধত নায়কসম্বন্ধীয় ব্যাপার আশ্রয় করিলে দীর্ঘসমাসযুক্ত সংঘটনা বিরোধী হয় না, কারণ দীর্ঘসমাসযুক্ত সংঘটনার যোজনের সঙ্গে রসের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ আছে; সেইখানে তদুচিত বাচ্যপ্রয়োগের অপেক্ষা থাকে। সুতরাং তাহাও অত্যন্ত পরিহার্য্য নহে। সকল প্রকারের সংঘটনায় প্রসাদনামক গুণ পরিব্যাপ্ত

থাকে। তাহা সকল রসে এবং সকল সংঘটনায় সাধারণভাবে থাকে—ইহা বলা হইয়াছে। প্রসাদগুণ হইতে বিচ্যুত হইলে সমাসবিহীন সংঘটনাও করুণরস বা বিপ্রলম্ভশৃঙ্গার রস প্রকাশ করিতে পারে না আর তাহা পরিত্যাগ না করিলে মধ্যমরকমের সমাসযুক্ত সংঘটনা যে তাহাদিগকে প্রকাশ করিতে না পারে তাহা নহে। সুতরাং সর্ব্বত্র প্রসাদগুণ অনুসরণীয়। অতএব "যো যঃ শস্ত্রং বিভর্ত্তি" ইত্যাদিতে যদি ওজোগুণের অস্তিত্ব অভিপ্রেত না হয়, তাহা হইলে প্রসাদগুণের অস্তিত্ব মানিতে হইবে, মাধুর্য্যের নহে। ইহাতে অচারুত্বও হয় না, কারণ অভিপ্রেত রসের প্রকাশ হইয়াছে। সুতরাং সংঘটনাকে গুণ হইতে অপৃথক্ বা পৃথক্ যাহাই মনে করা যাক্ না কেন, যে ঔচিত্যের কথা বলা হইয়াছে তাহার অনুসারেই সংঘটনার বিষয় নিয়মিত হয়। অতএব সংঘটনাও রসের ব্যঞ্জক হয়। রসের অভিব্যক্তির নিমিত্তভূত সংঘটনার যে নিয়ন্ত্রণহেতু অর্থাৎ ঔচিত্য এইমাত্র কথিত হইল, তাহাই গুণসমূহের নিয়ত বিষয়। সুতরাং গুণাশ্রিত বলিয়া তাহার যে ব্যবস্থা করা হইল তাহাও অবিরুদ্ধ।

**বিষয়মূলক অন্য ঔচিত্য সংঘটনাকে নিয়ন্ত্রিত করে, যেহেতু ভিন্ন ভিন্ন কাব্যপ্রভেদকে আশ্রয় করে বলিয়া তাহাও বিভিন্ন আকারের হইয়া থাকে। ৭॥**

বক্তা ও বাচ্যগত ঔচিত্য থাকিলেও বিষয়মূলক অন্য ঔচিত্য তাহাকে নিয়ন্ত্রিত করে। যেহেতু—কাব্যের প্রভেদসমূহ অর্থাৎ সংস্কৃত-প্রাকৃত-অপভ্রংশ ভাষায় রচিত মুক্তক; সন্দানিতক, বিশেষক, কলাপক, কুলক; পর্য্যায়বন্ধ, পরিকথা, খণ্ডকথা ও সকলকথা; সর্গবন্ধ ও অভিনেয়; আখ্যায়িকা ও কথা—ইত্যাদি। ইহাদিগকে আশ্রয় করে বলিয়া সে বিভিন্নতাপ্রাপ্ত হয়। সেইখানে মুক্তকে রসবন্ধে অভিনিবিষ্টমনা কবি যে রসের আশ্রয় করেন তাহাই ঔচিত্য। তাহা দর্শিতই হইয়াছে।

রসবন্ধে অভিনিবেশ না করিলে যেমন খুসী রচনা করা যায়। প্রবন্ধের ন্যায় মুক্তকেও কবিরা রসে অভিনিবেশ করিতেছেন—এইরূপ দেখা যায়। যেমন অমরু কবির মুক্তক শ্লোকগুলি রস নিঃষ্যন্দন করে বলিয়া কাব্যপ্রবন্ধরূপে প্রসিদ্ধিই পাইয়াছে। সন্দানিতকাদিতে গাঢ় নিবন্ধনের ঔচিত্যের জন্য মধ্যমরকমের সমাসযুক্ত ও দীর্ঘসমাসযুক্ত রচনা যুক্তিযুক্ত। প্রবন্ধের আশ্রয় করিলে প্রবন্ধের যে ঔচিত্যের কথা বলা হইয়াছে তাহা অনুসরণীয়। পর্য্যায়বন্ধে আবার সমাসহীন এবং মধ্যমরকমের সমাসযুক্ত সংঘটনা প্রযোজ্য। কোন কোন জায়গায় অর্থের ঔচিত্যের আশ্রয়ের জন্য দীর্ঘসমাসযুক্ত সংঘটনার প্রয়োগ করিলেও পরুষা ও গ্রাম্যা বৃত্তি পরিহর্ত্তব্য। পরিকথায় যদৃচ্ছা প্রয়োগ করা যাইতে পারে। কারণ সেইখানে শুধু ইতিবৃত্তের বিন্যাস হয় বলিয়া রসবন্ধাতিশয্যে অভিনিবেশ করা হয় না। যে খণ্ডকথা ও সকলকথা প্রাকৃতে প্রসিদ্ধ তাহাতে কুলকাদিরচনার বাহুল্যের জন্য দীর্ঘসমাসযুক্ত সংঘটনায়ও কোন বিরোধ নাই। কিন্তু রসের প্রতি সঙ্গতি রাখিয়া বৃত্তির ঔচিত্য অনুসরণীয়। সর্গবন্ধ মহাকাব্যে রসের তাৎপর্য্য থাকিলে রসানুসারে ঔচিত্য নির্ণয় করিতে হইবে। অন্যথা যথেচ্ছ রচনা করা যাইতে পারে। সর্গবন্ধ মহাকাব্য রচয়িতারা দুই মার্গই অবলম্বন করেন বলিয়া বলা যাইতে পারে যে রসতাৎপর্য্যময় মার্গই সুষ্ঠুতর। অভিনেয়ার্থ কাব্যে সর্ব্বথা রসবন্ধবিষয়ে অভিনিবেশ কর্ত্তব্য। আখ্যায়িকা ও কথায় গদ্য-রচনার বাহুল্য থাকায় এবং গদ্যে ছন্দোবন্ধভিন্ন অপর মার্গ অনুসৃত হওয়ায় গদ্যে সংঘটনার কোন নিয়ামক হেতু পূর্ব্বে করা না হইলেও এইখানে অল্প পরিমাণে করা হইল।

**এই যে ঔচিত্যের কথা বলা হইল তাহা ছন্দোবর্জ্জিত গদ্য-রচনায়ও সংঘটনার নিয়ামক। ৮॥**

এই যে বক্তা ও বাচ্যগত ঔচিত্য যাহা সংঘটনার নিয়ামক বলিয়া

কথিত হইল ইহা ছন্দোনিয়মবর্জ্জিত গদ্যরচনায়ও বিষয়ের অপেক্ষানুসারে নিয়ামক হয়। তদনুসারে বলা যাইতে পারে যে এখানেও যদি কবি অথবা কবিকল্পিত বক্তা রসভাবরহিত হয় তাহা হইলে যদৃচ্ছাক্রমে সংঘটনা রচনা করা যাইতে পারে। কিন্তু বক্তা রসভাবসমন্বিত হইলে পূর্ব্বোক্ত নিয়ম অনুসর্ত্তব্য। সেইখানেও বিষয়ের ঔচিত্য আছেই। আখ্যায়িকায় মধ্যমরকমের সমাসযুক্ত ও দীর্ঘসমাসযুক্ত সংঘটনাই বহুল পরিমাণে প্রযোজ্য। কারণ গদ্য গাঢ়বন্ধ হইলে শোভাশালী হয় এবং সেইখানেই তাহা উৎকর্ষ লাভ করে। কথায় গাঢ়বন্ধের প্রাচুর্য্য থাকিলেও গদ্যের রসবন্ধ সম্পর্কে যে ঔচিত্যের কথা বলা হইয়াছে তাহা অনুসর্ত্তব্য।

**রসবন্ধের সম্পর্কে যে ঔচিত্যের কথা বলা হইয়াছে যে রচনা তাহাকে আশ্রয় করিয়া থাকে তাহা সর্ব্বত্র দীপ্তিমান্ হয়। বিষয়ের অপেক্ষায় তাহা কিঞ্চিৎ বৈশিষ্ট্য লাভ করে। ৯॥**

অথবা পদ্যবৎ গদ্যবন্ধেও রচনা রসবন্ধের সম্পর্কে কথিত ঔচিত্যকে আশ্রয় করে। তাহা বিষয়ের পার্থক্য অনুসারে কিঞ্চিৎ বিভিন্নতা লাভ করে—সর্ব্বপ্রকারে নহে। তাই গদ্যবন্ধেও অতিদীর্ঘ সমাসযুক্ত সংঘটনা বিপ্রলম্ভশৃঙ্গার রস ও করুণ রসের অভিব্যক্তিতে শোভা পায় না। নাটকাদিতেও সমাসহীন সংঘটনাই যুক্তিযুক্ত। রৌদ্র, বীর প্রভৃতি রসের বর্ণনায়ও দীর্ঘসমাসযুক্ত সংঘটনা শোভা পায় না। বিষয়মূলক ঔচিত্য রসমূলক ঔচিত্যানুসারে গৃহীত হয় অথবা গৃহীত হয় না। তদনুসারে বলা যায় যে আখ্যায়িকায় অত্যন্ত সমাসযুক্ত সংঘটনা শোভা পায় না; নাটকাদিতে দীর্ঘসমাসযুক্ত সংঘটনা তাহার নিজের উপযোগী বিষয়েও শোভা পায় না। এইভাবে সংঘটনার নিয়ম অনুসর্ত্তব্য।

প্রবন্ধাত্মক অলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ্যধ্বনি রামায়ণমহাভারতাদিতে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা প্রসিদ্ধই। তাহা যে প্রকারে প্রকাশিত হয় তাহা ইদানীং প্রতিপাদিত হইতেছে—

**বিভাব, অনুভাব ও সঞ্চারী ভাবের ঔচিত্যের দ্বারা সৌন্দর্য্য-প্রাপ্ত কাহিনীর বিধান করিতে হইবে—তাহা কল্পিত কথাশরীরই হউক অথবা ইতিবৃত্তই হউক। ১০ ॥**

**যে অংশ ইতিবৃত্তের বশে আসিয়াছে অথচ যাহা রসের প্রতিকূল তাহাকে ত্যাগ করিয়া অপর কিছু কল্পনা করিলেও তাহাকে অভীষ্ট রসের উপযোগী করিয়া মধ্যে মধ্যে স্থাপিত করিয়া কথার উন্নয়ন করিতে হইবে। ১১ ॥**

**কেবল শাস্ত্রনিয়ম প্রতিপালনের ইচ্ছায় নহে রসাভিব্যক্তির অনুসারে সন্ধি ও সন্ধ্যঙ্গের যোজনা করিতে হইবে। ১২ ॥**

**অবসর অনুসারে কাব্যের মধ্যে রসের উদ্দীপন ও প্রশমন এবং যে অঙ্গী রসের বিচ্ছেদ আরব্ধ হইয়াছে তাহার অনুসন্ধান। ১৩ ॥**

**অলঙ্কার যোজনের শক্তি থাকিলেও রসের আনুকূল্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তাহাদের যোজন এবং রসাদির ব্যঞ্জকত্ব অনুসারে প্রবন্ধের রচনা। ১৪ ॥**

প্রবন্ধও রসাদির ব্যঞ্জক হয় ইহা বলা হইয়াছে; ব্যঞ্জকত্বের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তাহার রচনা বিধেয়। প্রথমে সেইরূপ কথাশরীরের যথোচিত বিধান করিতে হইবে যাহা বিভাব, অনুভাব ও সঞ্চারী ভাবের ঔচিত্যের দ্বারা চারুত্ব লাভ করিয়াছে অর্থাৎ যে রসভাবাদি প্রতিপাদন করিবার ইচ্ছা করা হইয়াছে তাহার সম্পর্কে যে বিভাব, ভাব, অনুভাব, সঞ্চারী ভাব উপযোগী হয় তাহার ঔচিত্যের জন্য। যে কথাশরীর সুন্দর হইয়াছে সেইরূপ কথাশরীরের বিধান করিতে হইবে; এমনভাবে তাহার রচনা করিতে হইবে যাহাতে তাহা রসের ব্যঞ্জক হয়। ইহা প্রথম নির্দ্দেশ। এই বিষয়ে বলা যাইতে পারে যে বিভাবের ঔচিত্য প্রসিদ্ধই। ভাবের ঔচিত্য তো প্রকৃতির ঔচিত্যের উপর নির্ভর করে। প্রকৃতি উত্তম, মধ্যম

ও অধম প্রকারানুসারে এবং দেবতা, মানুষাদি আশ্রয়ানুসারে বৈচিত্র্য লাভ করে। অন্যথা যদি কেবল মানুষকে আশ্রয় করিয়া দেবোচিত উৎসাহাদি অথবা যদি কেবল দেবতাকে আশ্রয় করিয়া মানুষের উৎসাহাদির বর্ণনা রচিত হয় তাহা হইলে তাহা অনুচিত হয়। তাই মনুষ্য রাজাদির বর্ণনায় সপ্তার্ণবলঙ্ঘনযুক্ত ব্যাপার রচিত হইলে তাহা সৌষ্ঠবশালিতাসত্ত্বেও অবশ্যই নীরস হয়; অনৌচিত্যই এই নীরসত্বের হেতু। প্রশ্ন হইতে পারে, সাতবাহন প্রভৃতির নাগলোকবামনাদির কথা শোনা যায়; তবে সমগ্র ধরণী-ধারণক্ষম রাজাদের অলোকসামান্য প্রভাবাতিশয্যের বর্ণনায় কি অনৌচিত্য আছে? না, তাহা নাই। আমরা বলি না যে রাজাদের প্রভাবাতিশয্যের বর্ণনা অনুচিত; কিন্তু কেবল মানুষকে আশ্রয় করিয়া যে কথাবস্তু কল্পনার দ্বারা সৃষ্ট হয় তাহাতে দেবোচিত ঔচিত্যের যোজনা করা সঙ্গত নহে। দেবশক্তিসম্পন্ন মানুষদের কথাতে উভয়ের উপযোগী ঔচিত্যের প্রয়োগে কোনই বিরোধিতা নাই। যেমন পাণ্ডবাদির কথাতে। কিন্তু সাতবাহন প্রভৃতির সম্পর্কে যে সকল কর্ম্মবৃত্তান্ত শোনা যায় শুধু তাহা বর্ণিত হইলেই রসানুযায়ী বলিয়া প্রতিভাত হয়। তাঁহাদের সম্পর্কে তদতিরিক্ত কিছু রচনা করিলে অনুচিত হইবে। সুতরাং ইহাই সারার্থ—

"অনৌচিত্য ছাড়া রসভঙ্গের অন্য কোন কারণ নাই। প্রসিদ্ধ ঔচিত্যানুযায়ী রচনা রসের শ্রেষ্ঠ গুপ্ত রহস্য স্বরূপ।"

সুতরাং ভরতের নাট্যশাস্ত্রে ইহা নির্দিষ্ট হইয়াছে যে নাটকাদিতে প্রখ্যাত বস্তুবিষয় ও প্রখ্যাত উদাত্ত নায়কের গ্রহণ অবশ্য কর্ত্তব্য। এইজন্য নায়কের ঔচিত্য বিষয়ে কবি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হয়েন না। যিনি কল্পিত বিষয়বস্তুসমন্বিত নাটকাদির সৃষ্টি করিবেন তিনি অপ্রসিদ্ধ, অনুচিত নায়ক স্বভাবের বর্ণনা দিলে তাহাতে মহাপ্রমাদ হইবে। এইরূপ আপত্তি হইতে পারে—উৎসাহাদিভাবের বর্ণনায় যদি দেবতা মনুষ্যাদিবিষয়ক

ঔচিত্যের কিছু কিছু পরীক্ষা করিতে চাহেন তবে করুন, কিন্তু রতি প্রভৃতিতে তাহার কি প্রয়োজন? ভরতের নাট্যশাস্ত্রে যে ঔচিত্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে তাহার অনুযায়ী ব্যবহারের দ্বারাই রতি দেবতাদের সম্পর্কেও বর্ণনীয় ইহা নিশ্চিতরূপে মানিয়া লওয়া যাইতে পারে। এই মত ঠিক নহে; রতিবিষয়ে ঔচিত্য অতিক্রম করিলে অতিশয় দোষ হয়। তাই অধম প্রকৃতির ঔচিত্য অনুসারে উত্তম-প্রকৃতিবিশিষ্ট নায়কনায়িকার রতি বর্ণনা করিলে কি উপহাস্যতা না হইবে? ভরতের অনুশাসনে ও শৃঙ্গারবিষয়ক প্রকৃতি অনুযায়ী তিন প্রকারের ঔচিত্যের কথা আছে। যদি বলা হয় যে যাহাকে দেববিষয়ক ঔচিত্য বলা হয় তাহা এখানে অনুপযোগী, তাহা হইলে উত্তর এই—শৃঙ্গার বিষয়ে দিব্য ঔচিত্য অপূর্ব্ব একটা কিছু নহে। তবে কি? ভরতের অনুশাসনের অনুমোদিত বিষয়ে রাজাদি উত্তম নায়ক সম্পর্কে যে শৃঙ্গারসম্পর্কিত রচনার উল্লেখ আছে তাহা দেবতাকে আশ্রয় করিলেও শোভা পায়। নাটকাদিতে রাজা প্রভৃতি সম্পর্কে প্রসিদ্ধ গ্রাম্যপদ্ধতিতে শৃঙ্গাররসের বর্ণনার খ্যাতি নাই; দেবতা সম্পর্কেও তাহা পরিহরণীয়। যদি বলা হয় যে নাটকাদি অভিনয়ের উদ্দেশ্যে রচিত হয় বলিয়া এবং সম্ভোগশৃঙ্গারের অভিনয় অসভ্য বলিয়া, সেইখানে তাহা পরিহার করিতে হইবে, তাহা হইলে উত্তরে বলিব, ইহা ঠিক নহে। যদি এবংবিধ বিষয় অভিনেয় কাব্যে অসভ্যতাদোষদুষ্ট হয়, তবে (অনভিনেয়) কাব্যে ইহার অসভ্যতা-দোষ কে নিবারণ করিতে পারে? সুতরাং অভিনেয় এবং অনভিনেয় কাব্যে উত্তম প্রকৃতির রাজাদির সঙ্গে উত্তম প্রকৃতির নায়িকাদের যদি গ্রাম্যসম্ভোগবর্ণনা দেওয়া হয়, তবে তাহা মাতাপিতার সম্ভোগবর্ণনার মত অতিশয় অসভ্য হয়। উত্তম দেবতা সম্পর্কেও ইহা প্রযোজ্য। অধিকন্তু, সম্ভোগশৃঙ্গারে সুরত-লক্ষণযুক্ত একটি প্রকারই সম্ভাবিত হয় না; পরস্পরকে প্রেমের সহিত দর্শনাদি অন্য যে সকল প্রকার আছে তাহা কেন উত্তম প্রকৃতি বিষয়ে

বর্ণিত হইবে না? সুতরাং উৎসাহের ন্যায় রতিতেও প্রকৃতির ঔচিত্য অনুসরণ করিতে হইবে, বিস্ময়াদিতেও সেইরূপ। এবংবিধ বিষয়ে মহাকবিরাও লক্ষ্য বস্তুতে যদি সমুচিত দৃষ্টি না দেন তাহা হইলে তাহা দোষেরই হইবে। তাঁহাদের প্রতিভাশক্তির দ্বারা সেই দোষ আচ্ছাদিত হয় বলিয়া ধরা পড়ে না ইহা বলাই হইয়াছে। ভরতের নাট্যশাস্ত্রাদিতে অনুভবের ঔচিত্য প্রসিদ্ধই। ইহা বলা হইতেছে—ভরতাদি বিরচিত অনুশাসন মানিয়া লইয়া, মহাকবি প্রবন্ধের পর্য্যালোচনা করিয়া এবং স্বীয় প্রতিভা অনুসরণ করিয়া কবি অবহিতচিত্ত হইয়া যত্ন করিয়া দেখিবেন যাহাতে তিনি বিভাবাদির ঔচিত্য হইতে ভ্রষ্ট না হয়েন। ঔচিত্যবান্ কথাশরীর—তাহা ইতিবৃত্তই হউক বা কল্পিতই হউক—গৃহীত হইলে তাহা রসের ব্যঞ্জক হয়; ইহার দ্বারা প্রতিপাদন করিতেছেন—বিবিধ রসবান্ কথা ইতিহাসাদিতে থাকিলেও তন্মধ্যে যে কথাশরীর বিভাবাদির ঔচিত্যসমন্বিত তাহাই গ্রাহ্য, অপর কিছু নহে। ইতিবৃত্ত হইতে আহৃত কথাশরীর অপেক্ষা কল্পিত কথাশরীরে কবিকে বিশেষ করিয়া প্রযত্নবান্ হইতে হইবে। সেইখানে কবি অনবধানবশতঃ ঔচিত্য হইতে স্খলিত হইলে কবির অব্যুৎপত্তির সম্ভাবনা খুব বেশী হইয়া পড়ে।

এই বিষয়ে এই সংগ্রহ শ্লোক দেওয়া হইতেছে—

"কল্পিত কথাবস্তু সেই সেই ভাবে রচনা করিতে হইবে যাহাতে তাহা সবই রসময় হইয়া প্রতিভাত হয়।"

সেই বিষয়ে উপায় হইতেছে সম্যক্‌রূপে বিভাবাদির ঔচিত্যের অনুসরণ। তাহা দেখানই হইয়াছে। অপিচ—

"যে রামায়ণাদি কথানিধান সম্পূর্ণরূপে রসসিদ্ধ হইয়াছে বলিয়া খ্যাতি আছে তাহাদের সঙ্গে নিজের রসবিরোধী ইচ্ছা যোজনীয় নহে।"

সেই সকল কথানিধানে স্বীয় ইচ্ছা যোজ্যই নহে। বলাই হইয়াছে—"কথামার্গে অল্প ব্যতিক্রমও সঙ্গত নহে।" যদি নিজের ইচ্ছার যোজনা

করিতেই হয় তাহা হইলে রসবিরুদ্ধ কোন ইচ্ছা যোজনীয় নহে। প্রবন্ধকে রসব্যঞ্জক করিতে হইলে এই দ্বিতীয় নিমিত্ত বা কারণ—যাহা ইতিবৃত্তির বশে আসিয়াছে কিন্তু রসের কথঞ্চিৎ প্রতিকূল এইরূপ অংশ পরিত্যাগ করিয়া কাব্যের মাঝে মাঝে পুনরায় তাহার অবতারণা করিলেও অভীষ্ট-রসের অনুসারে কথায় উন্নয়ন করিতে হইবে, যেমন কালিদাসাদির প্রবন্ধ-সমূহে, অথবা যেমন সর্ব্বসেনবিরচিত হরিবিজয়ে অথবা যেমন মদীয় অর্জ্জুনচরিত মহাকাব্যে। কাব্যরচয়িতা কবিকে সর্ব্বান্তঃকরণে রসের বশবর্ত্তী হইতে হইবে। সেইখানে তিনি ইতিবৃত্তে যদি রসের প্রতিকূল কোন অংশ দেখিতে পান তাহা হইলে ইহাকে দূর করিয়াও তিনি নিজে স্বাধীনভাবে অন্য কোন কথার সৃষ্টি করিবেন। ইতিবৃত্তমাত্রনির্ব্বাহে কবির কোন প্রয়োজনই নাই, কারণ ইতিহাসাদিতে তাহা প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে। প্রবন্ধকে রসব্যঞ্জক করিতে হইলে এই অপর মুখ্য নিমিত্ত বা কারণ—মুখ, প্রতিমুখ, গর্ভ, অবমর্শ, নির্বহণাখ্য সন্ধি এবং উপক্ষেপ প্রভৃতি তাহার অঙ্গাদির রসাভিব্যক্তির প্রয়োজনানুসারে ব্যবস্থাপন করিতে হইবে, যেমন রত্নাবলীতে; কেবল শাস্ত্রের অনুশাসন মানিয়া চলিবার উদ্দেশ্যে ইহাদের ব্যবস্থাপন করিলে চলিবে না। যেমন বেণী-সংহারে দ্বিতীয় অঙ্কে রসের প্রতিকূল হওয়া সত্ত্বেও বিলাসনামক প্রতিমুখ সন্ধ্যঙ্গ যে সন্নিবেশিত হইয়াছে তাহা কেবল ভরতমুনির মত অনুসরণ করিবার ইচ্ছার জন্য। প্রবন্ধকে রসের ব্যঞ্জক করিতে হইলে, আর একটি নিমিত্ত এই—অবসরানুসারে মধ্যে মধ্যে রসের উদ্দীপন ও প্রশমন, যেমন রত্নাবলীতেই। আবার যে অঙ্গী রসের বিশ্রান্তি আরব্ধ হইয়াছে তাহার পুনরায় অনুসন্ধান, যেমন তাপসবৎসরাজে। নাটকাদি প্রবন্ধবিশেষে রস অভিব্যক্ত করিতে হইলে অপর আর এক নিমিত্ত বুঝিয়া রাখিতে হইবে—অলঙ্কার রচনা করিবার শক্তি থাকিলেও যাহাতে তাহারা রসের অনুকূল হয় এইভাবে তাহাদের যোজনা করিতে হবে। শক্তিমান কবিও কখনও

কখনও অলঙ্কারের প্রতি অতিশয় অনুরাগের জন্যই রসের সহিত সম্বন্ধের অপেক্ষা না রাখিয়া অলঙ্কারের রচনায় একাগ্রচিত্তে মনোনিবেশ করিয়াছেন—এইরূপ দেখাই যায়। অপিচ,

**এই ধ্বনির অনুস্বানাত্মক যে অন্য প্রভেদ উদাহৃত হইয়াছে তাহাও কোন কোন কাব্য প্রবন্ধকে আশ্রয় করিয়া প্রতিভাত হয়। ১৫॥**

এই বিবক্ষিতান্যপরবাচ্যধ্বনির অনুরণনরূপব্যঙ্গ্য নামক যে দুইপ্রকার বিশিষ্ট প্রভেদ উদাহৃত হইয়াছে তাহাও কোন কোন কাব্যপ্রবন্ধকে নিমিত্ত করিয়া ব্যঞ্জকরূপে প্রকাশিত হয়, যেমন মধুমথনবিজয়ে পাঞ্চজন্যের উক্তিতে। অথবা যেমন আমারই বিষমবাণলীলায় কামদেবের সহচর সমাগমের বর্ণনায়। অথবা যেমন মহাভারতে গৃধ্রগোমায়ু সংবাদাদিতে।

**কোথাও কোথাও অলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ্যধ্বনি সুপ্, তিঙ্, বচন ও সম্বন্ধের দ্বারা, কারকশক্তির দ্বারা এবং কৃৎ, তদ্ধিত ও সমাসের দ্বারা প্রকাশ্য হয়। ১৬॥**

ধ্বনির অলক্ষ্যক্রম রসাদি আত্মা সুপ্-বিশেষের দ্বারা, তিঙ্-বিশেষের দ্বারা, বচন-বিশেষের দ্বারা, সম্বন্ধ-বিশেষের দ্বারা, কৃৎ-বিশেষের দ্বারা, তদ্ধিত-বিশেষের দ্বারা, এবং সমাসের দ্বারা অভিব্যজ্যমান হয় এইরূপ দেখা যায়; 'চ'-শব্দের প্রয়োগের দ্বারা নিপাতন, উপসর্গ, কাল প্রভৃতি বোঝা যায়। যেমন—

"আমার পক্ষে ইহাই ধিক্কারের কথা যে আমার শত্রুর দল আছে; সেই শত্রুও আবার এই তাপস; সেও এইখানেই রাক্ষসকুল নিধন করিতেছে। অহো, রাবণ জীবন ধারণ করিয়া আছে। ইন্দ্রজিৎকে ধিক্, ধিক্; নিদ্রা হইতে জাগরিত কুম্ভকর্ণকে দিয়াই বা কি হইবে? স্বর্গরূপ ছোটগ্রামটিকে বিলুণ্ঠন করিয়া আমার এই যে ভুজনিচয় পরিপুষ্ট হইয়াছে ইহাদের দ্বারাই বা কি হইবে?"

এই যে শ্লোক ইহাতে ইহাদের সকলের ব্যঞ্জকত্ব বহুল পরিমাণে এবং স্ফুট হইয়াই প্রকাশিত হইতেছে। সেখানে "যে যদরয়ঃ"—ইহার দ্বারা সুপ্, সম্বন্ধ ও বচনের অভিব্যঞ্জকত্ব দেখা যাইতেছে। "তত্রাপ্যসৌ তাপসঃ"—এখানে তদ্ধিত (তাপসঃ) ও নিপাতনের (অত্রাপি) ব্যঞ্জকত্ব। "সোঽপ্যত্রৈব নিহন্তি রাক্ষসকুলং জীবত্যহো রাবণঃ" এইখানে তিঙ্-বিভক্তির শক্তি (নিহন্তি, জীবতি), কারকশক্তি (অত্র, কুলম্): "ধিক্ ধিক্ শক্রজিতম্"—এই শ্লোকার্দ্ধে কৃৎ (জিতম্, প্রবোধিতবতা), তদ্ধিত (গ্রামটিকা), সমাস (স্বর্গগ্রামটিকা), উপসর্গ (বিলুণ্ঠন, উচ্ছূনৈঃ, প্রবোধিতবতা)—ইহাদের ব্যঞ্জকত্ব। এইরূপ ব্যঞ্জকত্বের বহুল প্রয়োগ সংঘটিত হইলে কাব্যের বচনাসৌন্দর্য্য সর্ব্বাধিকপরিমাণে সমুন্মীলিত হয়। যেখানে ব্যঙ্গ্যার্থ প্রকাশক একটিমাত্র পদের আবির্ভাব হয়, সেই কাব্যেও কিরূপ রচনাসৌন্দর্য্য দেখা যায়; যেখানে বহু ব্যঞ্জকের সমাবেশ হইয়াছে তাহার কথা আর কি বলিব? যেমন এইমাত্র উদাহৃত শ্লোকে। এখানে "রাবণঃ" এই পদটি অর্থান্তরসংক্রমিত-বাচ্যধ্বনিপ্রভেদের দ্বারা অলঙ্কৃত হইলেও, পরবর্ত্তী ব্যঞ্জকগুলি সমুদ্ভাসিত হয়। প্রতিভাবৈশিষ্ট্য-সম্পন্ন মহাত্মারা এইরূপ বচনাপ্রকার বহুল পরিমাণে প্রয়োগ করেন তাহা দেখাই যায়।

যেমন মহর্ষি ব্যাসের—

"সুখ অতিক্রান্ত হইয়াছে, দারুণ দুঃখ প্রত্যুপস্থিত হইয়াছে—এই তো কালের অবস্থা। আগামীকাল, আগামীকাল—এমনি করিয়া পাপসঙ্কুলদিবসবিশিষ্টা পৃথিবী গতযৌবনা হইয়া পড়িয়াছে।"

কৃৎ (অতিক্রান্ত), তদ্ধিত (পাপীয়), বচন (কালাঃ)—ইহাদের দ্বারা এখানে অলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ্য ধ্বনি, আর 'পৃথিবী গতযৌবনা'—ইহার দ্বারা অত্যন্ততিরস্কৃতবাচ্যধ্বনি প্রকাশিত হইয়াছে।

এই সুপ্ প্রভৃতির প্রত্যেকের একটি একটি করিয়া অথবা সমবেতভাবে

ব্যঞ্জকত্ব মহাকবিদের কাব্যপ্রবন্ধসমূহে প্রায়ই দেখা যায়। সুবন্তের ব্যঞ্জকত্ব যথা—

"তোমার সুহৃদ্ নীলকণ্ঠ ময়ূরকে আমার কান্তা কঙ্কণদ্বয়ের শিঞ্জনের সহিত মধুর তালে নৃত্য করান। এইরূপ ময়ূর যেখানে দিনান্তে বাস করে।" ( যাম্, তালৈঃ ইত্যাদি )।

তিঙন্তের ব্যঞ্জকত্ব যথা—

"( হে শঠ, ) তুমি সরিয়া যাও, অশ্রুমোচন করিবার জন্যই আমার দৈবাহত চক্ষুর্দ্বয় নির্ম্মিত হইয়াছে ; তুমি ইহাদিগকে বিকশিত করিও না। দর্শনমাত্রে উন্মত্ত এই চক্ষু দুইটি তোমার এবংবিধ হৃদয় জানিতে পারে নাই।" ( অপসর )

অথবা যেমন—

"হে বালক, আমার পথ রোধ করিও না ; তুমি দূরে যাও। অহো তুমি অনিপুণ ; আমরা পরাধীন ; আমাদের শূন্য গৃহ রক্ষণ করিতে হইবে।"

সম্বন্ধের ব্যঞ্জকত্ব যথা—

"হে বালক, তুমি অন্যত্র চলিয়া যাও ; স্নাননিরতা আমাকে তুমি এখন এত তীক্ষ্নদৃষ্টি দিয়া দেখিতেছ কেন ? ওহে, যাহারা স্ত্রীকে ভয় করে বাপীতট তাহাদের জন্য নহে।" ( জায়াভীরুকাণাং )

প্রাকৃতে তদ্ধিত বিষয়ে 'ক' প্রত্যয়ের ( জায়াভীরুকাণাং ) প্রয়োগ হইয়াছে এবং তাহার ব্যঞ্জকত্ব নিবেদিত হইতেছে। 'ক' প্রত্যয় অবজ্ঞার আতিশয্য বুঝাইতেছে। বৃত্তির ঔচিত্যের সহিত সমাসসমূহের প্রয়োগে ব্যঞ্জকত্ব থাকে। নিপাতনের ব্যঞ্জকত্ব যথা—

"একদিকে সেই প্রিয়ার সঙ্গে আমার এই বিচ্ছেদ সমুপনত এবং তাহাই সুদুঃসহ। তদুপরি নবমেঘের উদয়ের জন্য আতপ্ততা হইয়া যাওয়ায় দিনগুলি অধিকাংশে রম্য হইবে।"

এখানে 'চ'-শব্দ। অথবা যেমন—

"সে বারংবার অঙ্গুলীর দ্বারা অধরোষ্ঠ আচ্ছাদিত করিয়াছিল; অর্দ্ধস্ফুট নিষেধবাক্য উচ্চারণ করিবার সময় লজ্জাতিশয্যের জন্য মুখমণ্ডল অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিয়াছিল এবং স্কন্ধের উপর ফিরিয়া গিয়াছিল। এই সুনয়নার মুখমণ্ডল আমি কোনক্রমে তুলিয়া ধরিয়াছিলাম, চুম্বন তো করি নাই।"

এখানে 'তু'-শব্দ। নিপাতন সমূহের দ্যোতকত্ব প্রসিদ্ধ হইলেও এখানকার ব্যঞ্জকত্ব রসের প্রয়োজনানুসারে হইয়াছে—ইহা দ্রষ্টব্য। উপসর্গসমূহের ব্যঞ্জকত্ব যথা—

"কোথাও শুকপক্ষী কোটরে অবস্থিত থাকিলে তাহাদের মুখ হইতে যে উড়িধান স্খলিত হইয়াছে, তাহা গাছের নীচে পড়িয়া আছে; কোথাও প্রস্তরখণ্ডে ইঙ্গুদীফল চূর্ণ করায় প্রস্তরখণ্ডগুলি অতি স্নিগ্ধ হইয়াছে। বৃক্ষগুলি পলায়নপর না হইয়া নিঃশঙ্কচিত্তে রথের শব্দ শুনিতেছে; জলাশয়ের পথগুলি বল্কলের অগ্র হইতে নিঃস্যন্দিত জলের লেখায় অঙ্কিত হইয়াছে।" ইত্যাদিতে।

একটি পদে দুইটি তিনটি করিয়া উপসর্গের একত্র প্রয়োগ করিলে তাহা রসের আনুকূল্য করার জন্যই নির্দ্দোষ হয়। যেমন—

"অন্ধকারের উত্তরীয় বিনষ্ট হইয়া যাওয়ায় মনুষ্য ও জন্তুদিগকে আবরণহীন অবস্থায় সমুদ্বীক্ষণ করিয়া" অথবা যেমন—"মনুষ্যবৃত্ত্যা সমুপাচরন্তম্" ইত্যাদিতে।

নিপাতন সম্পর্কেও ইহাই প্রযোজ্য। যেমন—"অহো বতাসি স্পৃহণীয়বীর্য্যঃ" (অহো, তোমার বীর্য্য স্পৃহণীয় বটে) ইত্যাদিতে। অথবা যেমন—

"গুণিজন উৎসাহ প্রাপ্ত হইলে যাঁহারা সুখে জীবন ধারণ করেন, যাঁহারা নিজের দেহে আনন্দ ধরিয়া রাখিতে পারেন না, যাঁহারা প্রীতিতে

নৃত্য করেন, যাঁহাদের আনন্দাশ্রু নিঃস্যন্দিত হয় এবং পুলকের সঞ্চার হয়, অসাধুজনের পরিপোষণ করিয়া শঠস্বভাব দৈব তাঁহাদিগকেই বিনষ্ট করিলে কোথায় আশ্রয় লই ; হা ধিক ! কি ক্লেশ !" ইত্যাদিতে।

ব্যঞ্জকত্বের প্রয়োজনানুসারেই পদের পুনরুক্তি করিলে তাহাও শোভা আনয়ন করে—

"প্রতারণায় যে খলজনের চিত্ত নিহিত, যে স্বার্থসাধনতৎপর সে যে বহু কপট চাটুবাক্য বলে তাহা সাধুজনেরা যে জানেন না তাহা নহে, অবশ্যই জানেন। কিন্তু ইহার কপট প্রণয়কে নিষ্ফল করিতে পারেন না।" ( ন ন বিদন্তি বিদন্তি )

কালের দ্বারা ব্যঞ্জকত্বের উদাহরণ, যেমন—

"যে পথগুলি বন্ধুর ও অবন্ধুর এবং চতুর্দ্দিকে মন্থরগামী পথিকের সঞ্চরণস্থল তাহারা শীঘ্রই মনোরথের পক্ষেও দুর্লঙ্ঘ্য হইবে।"

এখানে "অচিরাদ্ভবিষ্যন্তি পন্থানঃ" এই ভবিষ্যন্তি-পদে কালবিশেষ-বাচক প্রত্যয় রসপরিপুষ্টির হেতু হইয়া প্রকাশিত হইতেছে। এই গাথার অর্থ প্রবাসবিপ্রলম্ভশৃঙ্গারে বিভাবত্বের জন্য পুনঃ পুনঃ চর্ব্বণার যোগ্য হইয়া রসশালী হইয়াছে। এখানে যেমন প্রত্যয়-অংশ ব্যঞ্জক হইয়াছে তেমন কোন কোন জায়গায় শব্দের মূল ( প্রকৃতি ) অংশও ব্যঞ্জক হয়, যেমন—

"সেই গৃহের ভিত্তি ছিল জীর্ণ, এই মন্দির আকাশস্পর্শী ; সেই গাভী ছিল জরাগ্রস্ত আর এখন মেঘ সদৃশ হস্তীরা শ্রেণীবদ্ধ হইয়া চরিয়া বেড়াইতেছে।

সেই ঢেঁকির শব্দ ছিল অতি ক্ষুদ্র, আর এখন নারীদের এই মধুর সঙ্গীত। কি আশ্চর্য্য, ব্রাহ্মণ কয়েক দিনের মধ্যেই এই সম্পদ্ লাভ করিয়াছেন।"

এই শ্লোকে 'দিবসৈঃ'—এই পদে প্রকৃতি বা মূল অংশও দ্যোতক

হইয়াছে। এই শ্লোকে সর্ব্বনামসমূহের ব্যঞ্জকত্বের উদাহরণ পাওয়া যায়। এখানে সর্ব্বনামগুলিই ব্যঞ্জক হইয়াছে ইহা মনে করিয়াই কবি 'কোথায়' (ক্ব) ইত্যাদি শব্দের প্রয়োগ করেন নাই। এই ভাবে সহৃদয় ব্যক্তিরা নিজেরাই অন্য আরও ব্যঞ্জকবিশেষ কল্পনা করিয়া লইবেন। পদ, বাক্য ও রচনার দ্যোতকত্বেব কথা বলাতেই এই সকল বিষয় বলা হইয়াছে; তথাপি নানা প্রকারের ব্যুৎপত্তি জন্মাইবার জন্য পুনরুক্তি করা হইল। বলা হইয়াছে যে রসাদি অর্থসামর্থ্যের দ্বারা আক্ষিপ্ত হয়; তাই সুপ্ প্রভৃতির ব্যঞ্জকত্বের বিবরণ অপ্রাসঙ্গিকই হইয়া পড়ে—এইরূপ আপত্তি হইতে পারে। এখানে পদসমূহের ব্যঞ্জকত্বের কথা বলিবার অবসরে সুপ্ প্রভৃতির কথা উল্লিখিত হইল। অপিচ রসাদি অর্থবিশেষের দ্বারা আক্ষিপ্ত হইলেও সেই অর্থবিশেষ ব্যঞ্জক শব্দের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত থাকে বলিয়া তাহাদের ব্যঞ্জকস্বরূপ যে বিভাগ করিয়া জানা যায় তাহা যুক্তিযুক্তই বটে।

কোন কোন শব্দবিশেষের চারুত্বও এবং অন্যান্য স্থলের চারুত্ব যে ভাগ করিয়া দেখান হইয়াছে সেই চারুত্বও তাহাদের ব্যঞ্জকত্বের দ্বারা পাওয়া যায়, ইহা বুঝিতে হইবে। যে ব্যঞ্জকের চারুত্ব এখন রচনাবিশেষে শীঘ্র প্রতিভাত হইতেছে না তাহা রচনায় এক সময় দেখা গিয়াছে। তাহাই অভ্যাসবশতঃ সেইখানেও প্রতিভাত হয়, যদিও ইহারা সেই সেই প্রসঙ্গ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। এই সকল ব্যঞ্জক প্রবাহপতিতের ন্যায়; প্রাচীন পরিচয়ের স্রোতোবেগেই ব্যঞ্জকত্ব লাভ করে। ইহা অবধান করিতে হইবে। এইরূপ না হইলে একাধিক শব্দের বাচকত্ব একরকমের হইলেও চারুত্ব বিষয়ে তাহাদের পার্থক্য হয় কেন? যদি বলা হয় শব্দের এই বৈশিষ্ট্য অন্য ব্যাপার; ইহা সহৃদয়ের সংবেদ্য, তবে প্রশ্ন করিব, এই সহৃদয়ত্ব বস্তুটি কি? ইহা কি রসভাবের সঙ্গে সম্পর্কহীন, শুধু কাব্যবিষয়ক সঙ্কেত বা নিয়ম সম্পর্কে অভিজ্ঞতা না রসভাবময়

কাব্যস্বরূপ জানিবার নৈপুণ্য? যদি প্রথম পক্ষ অবলম্বন করা হয় তাহা হইলে তথাবিধ সহৃদয় ব্যক্তিরা যে শব্দবিশেষের বিধান দিবেন, তাহার কোন ধরাবাঁধা নিয়ম থাকিবে না, যেহেতু অন্য সময়ে তাঁহারাই আবার ঐ ঐ শব্দের অন্যরূপ ব্যবস্থা করিতে পারেন। দ্বিতীয় পক্ষ অবলম্বন করিলে রসজ্ঞতাকেই সহৃদয়ত্বের লক্ষণ বলিয়া ধরিতে হইবে। তথাপি সহৃদয় ব্যক্তিরা শব্দের বৈশিষ্ট্য অনুভব করেন; রসাদি অর্থ বুঝাইবাব সামর্থ্যই শব্দের নৈসগিক বৈশিষ্ট্য। তাই তাহাদের চারুত্ব মুখ্যভাবে ব্যঞ্জকত্বকেই আশ্রয় করে। যখন তাহারা বাচকত্বকে আশ্রয় করে তখন অর্থ বুঝাইবার শক্তি অনুসারে তাহারা প্রসাদগুণরূপ বৈশিষ্ট্য লাভ করে। আর যেখানে অর্থের সঙ্গে সম্পর্ক নাই সেইখানে অনুপ্রাসাদিই তাহাদের বৈশিষ্ট্য।

এইভাবে রসাদির ব্যঞ্জকদের স্বরূপ বলিয়া তাহাদের প্রতিবন্ধকদের লক্ষণ বলিবার জন্য এই উপক্রম করা হইতেছে—

**প্রবন্ধে অথবা মুক্তকেও যিনি রসাদির সন্নিবেশ করিতে ইচ্ছা করেন সেই সুধী ব্যক্তি প্রতিবন্ধকসমূহের পরিহারে যত্নবান্ হইবেন। ১৭॥**

কাব্যপ্রবন্ধে অথবা মুক্তকেও রস এবং ভাবের সন্নিবেশ করিতে যিনি আগ্রহশীল সেই কবি প্রতিবন্ধকের পরিহার করিতে যত্ন নেন্। তাহা না হইলে তিনি একটি রসময় শ্লোক রচনাও করিতে পারিবেন না। সেই সকল রসবিরোধী বস্তু আবার কি যাহা কবিকে যত্নপূর্ব্বক পরিহার করিতে হইবে? তাই বলা হইতেছে—

**প্রস্তাবিত রসের বিরোধী রসের সম্পর্কিত বিভাবাদির গ্রহণ; অপ্রাসঙ্গিক অন্য বস্তু সম্পর্কিত হইলেও তাহার বিস্তারিত বর্ণন। ১৮॥**

**উপযুক্ত অবসর ব্যতিরেকে রসের বিচ্ছেদ এবং উপযুক্ত**

**অবসর ব্যতিরেকে রসের প্রকাশ। যে রস পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছে বারংবার তাহারও প্রকাশন—এই সমস্ত কার্য্য এবং বৃত্তির অনৌচিত্য রসের পরিপন্থী হয়। ১৯ ॥**

অন্য যে রস প্রস্তাবিত রসের পরিপন্থী তাহার সম্পর্কিত বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারী ভাবের গ্রহণ রসের বিরোধের হেতু হইবে ইহা সম্ভব। সেইখানে বিরোধী রসের বিভাব গ্রহণ করিবার উদাহরণ যেমন, শান্তরসের স্থলে কোন কোন বস্তু তাহার বিভাবরূপে নিরূপিত হইলে তাহার পরই শৃঙ্গারাদিরই বিভাবের বর্ণনায়। বিরোধী রস ও ভাবের গ্রহণের উদাহরণ, যেমন প্রিয়ের প্রতি প্রণয়কুপিতা কামিনীদিগকে বৈরাগ্যসূচক কথার দ্বারা অনুনয় করিল। বিরোধী রসের অনুভাবের গ্রহণ, যেমন—প্রণয়কুপিতা নায়িকা অপ্রসন্ন হইলে কোপাবিষ্ট নায়কের রৌদ্ররসের অনুভাবের বর্ণনায়। রসভঙ্গের অপর একটি হেতু এই—প্রস্তাবিত রসের প্রয়োজনে অপর কোন বস্তুর বিস্তারিত বর্ণনা, যদিও সেই বস্তু প্রস্তাবিত রসের সঙ্গে কোনও প্রকারে সম্বন্ধ থাকে। যেমন, বিপ্রলম্ভশৃঙ্গাররসের কোন নায়ককে বর্ণনা করিতে আরম্ভ করা হইলে কবি যদি যমক প্রভৃতি অলঙ্কারের নির্ম্মাণের আনন্দে মত্ত হইয়া বিরাট প্রবন্ধের দ্বারা পর্ব্বতাদির বর্ণনা করেন। উপযুক্ত অবসর ছাড়াই রসের বিচ্ছেদ এবং উপযুক্ত অবসর ছাড়াই রসের প্রকাশন—ইহা রসভঙ্গের অপর হেতু বলিয়া জানিতে হইবে। সেইখানে অবসর ব্যতিরেকে রসের বিচ্ছেদের দৃষ্টান্ত, যেমন—কোন নায়ক কোন নায়িকার সঙ্গে মিলন-স্পৃহা করিয়াছে, শৃঙ্গাররস পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছে, ইহাদের পরস্পরের প্রতি অনুরাগও জানা হইয়াছে; তখন মিলনের চিন্তার উচিত ব্যবহার পরিত্যাগ করিয়া কবি যদি স্বতন্ত্রভাবে অন্য ব্যাপারের বর্ণনা করেন। অনবসরে রসের প্রকাশনের উদাহরণ, যেমন—যে যুদ্ধ কল্পপ্রলয়ের সৃষ্টি করিতে পারে এইরূপ যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে; ইহাতে বিবিধ বীরের নাশ হইতেছে। এই

যুদ্ধের নায়ক রাম দেব-সদৃশ; ইহার হৃদয়ে বিপ্রলম্ভশৃঙ্গাররসোচিত ভাব সঞ্চারিত না হইলেও উপযুক্ত কারণ ছাড়াই যদি শৃঙ্গাররসসম্বন্ধীয় কথার অবতারণা করা হয়। এবংবিধ বিষয়ে দৈবকৃত কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়তা ঘটাইয়া প্রতিনায়কের পরিহার করা সঙ্গত নহে, কারণ কবি প্রধানভাবে রসসৃষ্টিতেই প্রবৃত্ত হইবেন—ইহাই যুক্তিসঙ্গত। "আলোকার্থী যথা দীপশিখায়াং যত্নবাঞ্জনঃ" (আলোকার্থী যেমন আলোকলাভের উপায় হিসাবে দীপশিখায় যত্নবান্ হয়েন) ইত্যাদির (১।৯) দ্বারা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে ইতিবৃত্তবর্ণনা রসসৃষ্টির উপায়মাত্র। অঙ্গাঙ্গিভাবের বোধশূন্য হইয়া রস ও ভাব প্রকাশ করিতে গেলে এবং শুধু ইতিবৃত্তকে প্রাধান্য দিলে এবংবিধ দোষ হইবে। সুতরাং রসাদিরূপে ব্যঙ্গের তাৎপর্য্যেই তাঁহাদের লক্ষ্য রাখা সঙ্গত। এই জন্যই আমরা এই প্রবন্ধ আরম্ভ করিয়াছি, শুধু ধ্বনিপ্রতিপাদনে অভিনিবেশ ইহার কারণ নহে। রসভঙ্গের অপর একটি হেতুতেও মনোনিবেশ করিতে হইবে—যে রস পরিপুষ্ট হইয়া গিয়াছে তাহারও বারংবার প্রকাশন। যে রস উপভুক্ত হইয়া নিজের সামগ্রীর দ্বারা পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছে তাহা যদি পুনঃপুনঃ বর্ণিত হয় তাহা হইলে তাহাকে পরিম্লান ফুলের মত মনে হইবে। তারপর, বৃত্তির ব্যবহারে যে অনৌচিত্য তাহাও রসভঙ্গের হেতুই। যেমন কোন নায়িকা যদি সমুচিত ভঙ্গী ব্যতিরেকেই নিজে নায়ককে নিজের সম্ভোগের অভিলাষ বলে। অথবা ভরতের নাট্যশাস্ত্রে প্রসিদ্ধ কৈশিকী প্রভৃতি যে সকল বৃত্তি আছে আর উপনাগরিকা প্রভৃতি যে সকল বৃত্তি অন্য কাব্যালঙ্কারে প্রসিদ্ধি পাইয়াছে তাহাদের যে অনৌচিত্য বা অনুপযোগী বিষয়ে প্রয়োগ তাহাও রসভঙ্গের হেতু। এইভাবে রসের এই সকল প্রতিবন্ধক এবং কবিগণ এইরূপে অন্য যে সকল প্রতিবন্ধক নিজে কল্পনা করিবেন তাহাদের পরিহারবিষয়ে সৎকবিরা অবহিত হইবেন।

এই বিষয়ে এই সংগ্রহ শ্লোক দেওয়া যাইতেছে :

"রসাদি সুকবিদের ব্যাপারের মুখ্য বিষয়। সুকবিরা এই রসাদির ান্নিবেশকার্য্যে সর্ব্বদা সাবধান হইয়া ব্রতী হইবেন যাহাতে তাঁহারা ভ্রমে াতিত না হয়েন। যে কাব্যপ্রবন্ধ রসহীন তাহা মহাকবির অপযশের ারণ। তাহার জন্য তিনি অকবিই হইয়া পড়িবেন ; এবং এইরূপ কাব্য াচনা করিলে অপর কেহ তাঁহার নাম স্মরণ করিবে না। প্রাচীন কবিরা বশৃঙ্খলবাক্‌ হইয়াও কীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়াছেন। অতএব সেই নজিরে ানীষী ব্যক্তি এই নীতি ত্যাগ করিবেন না। বাল্মীকি, ব্যাস প্রমুখ য সকল প্রখ্যাত কবীশ্বর আছেন, আমাদের দ্বারা দর্শিত শাস্ত্র তাঁহাদের অভিপ্রায় বহির্ভূত নহে।" ইতি।

**বিবক্ষিত বা প্রস্তাবিত রস প্রতিষ্ঠা লাভ করিলে পর বিরোধী াসসমূহ তাহার বশীভুত বা অঙ্গভুত হইলে তাহাদের বর্ণনা দোষাবহ হইবে না। ২০ ॥**

কিন্তু বিবক্ষিত রস সামগ্রীর দ্বারা পরিপুষ্টি লাভ করিলে বরোধীরা অর্থাৎ বিরোধী রসের অঙ্গসমূহ যদি উহার বশবর্ত্তী হয় অথবা উহার অঙ্গ হয় তাহা হইলে তাহাদের বর্ণনায় কোন দোষ হয় া। বাধ্যত্ব বা বশবর্ত্তিতার লক্ষণ এই যে বিবক্ষিত রস ইহাদিগকে অভিভূত করিতে পারে ; তাহা না হইলে হয় না। সেইভাবে তাহাদের র্ণনা করিলে তাহারা প্রস্তাবিত রসের পরিপুষ্টিসাধনই করে। তাহারা যদি প্রস্তাবিত রসের অঙ্গত্ব লাভ করে তাহা হইলে তাহাদের বরোধিতাই থাকে না। বিরোধী রস দুইভাবে অঙ্গত্ব লাভ করিতে পারে—স্বাভাবিকভাবে অথবা সমারোপিত হইয়া। তন্মধ্যে যাহা স্বাভাবিক তাহার কথা বলা হইলেই আর বিরোধ থাকে না, যেমন বিপ্রলম্ভশৃঙ্গাররসে ব্যাধি প্রভৃতি অঙ্গসমূহের। যাহারা তাহাদের অঙ্গ য় তাহাদের কথা বলিলেই দোষ হয় না ; যাহারা অঙ্গ হয় না তাহাদের

সম্পর্কে এই নিয়ম খাটে না। মরণের সন্নিবেশ যদি বিপ্রলম্ভশৃঙ্গারের অঙ্গং হয় তবুও তাহা করা উচিত হইবে না। কারণ রসের যাহা আশ্রয় তাহা বিয়োগ হইলে রসেরও আত্যন্তিক বিনাশ হইবে। যদি বলা হয় যে সেই সকল বিষয়ে করুণরসের তো পরিপুষ্টি হয় তাহা হইলে তাহার উত্তরে বলি যে এই যুক্তি ঠিক নহে, কারণ করুণরস এই ক্ষেত্রে প্রস্তাবিত রস নহে এবং ইহার দ্বারা প্রস্তাবিত বিপ্রলম্ভশৃঙ্গাররসের ধ্বংস হইবে। যেখানে করুণরসই কাব্যের বিবক্ষিত অর্থ, সেইখানে মরণের সন্নিবেশে কোন বিরোধ নাই। শৃঙ্গার রসে মরণের পর দীর্ঘকাল যাইতে না যাইতেই যদি মৃতের প্রত্যাবর্তন সম্ভব হয় তাহা হইলে মরণের অবতারণায় অতিশয় বিরোধিতা হইবে না। যদি মৃত্যুর পর দীর্ঘকাল অতিবাহিত হয় তাহা হইলে কাব্যের মধ্যস্থলে রসপ্রবাহের বিচ্ছেদ হয়; সেই জন্য যে কবি রসের সন্নিবেশকেই প্রাধান্য দেন তিনি এবংবিধ ইতিবৃত্ত রচনাকে পরিহার করিবেন।

বিবক্ষিত রস প্রতিষ্ঠা লাভ করিলে, বিরোধী রসাঙ্গ যদি তাহার বশীভূত হয় তাহা হইলে দোষাবহ হয় না। ইহার উদাহরণ যেমন—

"অহো কোথায় এই কুকার্য্য আর কোথায় বা চন্দ্রবংশ! তাঁহাকে যদি আর একবার দেখা যাইত! তাহা হইলে বুঝা যাইত যে আমার শাস্ত্রজ্ঞান-জনিত পুণ্য আছে যদ্দ্বারা দোষের প্রশমন হয়। তিনি যখন কোপাবিষ্ট তখনও তাঁহার মুখ রমণীয়। নিষ্পাপ ধীমান্ ব্যক্তিরা কি বলিবেন? কিন্তু স্বপ্নেও তিনি দুর্লভ হইয়াছেন। হে চিত্ত, তুমি সুস্থ হও। সেই ধন্য যুবক কে, যে তাঁহার অধর-সুধা পান করিবে?"

অথবা যেমন মহাশ্বেতার প্রতি পুণ্ডরীকের অতিশয় অনুরাগ জন্মিলে দ্বিতীয় মুনিকুমারের উপদেশ বর্ণনায়। রসাঙ্গ স্বাভাবিকভাবে প্রস্তাবিত রসের অঙ্গত্ব লাভ করিলে যে দোষহানি হয় তাহার উদাহরণ, যেমন—

"জলদভুজগজাত বিষ (জল) বিরহিণী নারীতে শিরোঘূর্ণন, বিষয়ে

অনভিলাষ, মানসিক ঔদাস্থ, বাহ্ম ইন্দ্রিয়ের বৈকল্য, মূর্চ্ছা, অন্ধতা, শরীরপীড়া ও মুমূর্ষুতা আনয়ন করে।" ইত্যাদিতে। অঙ্গত্বলাভ যদি স্বাভাবিক না হইয়া সমারোপিত হয়, তাহা হইলেও তাহাতে যে বিরোধ হয় না তাহার উদাহরণ, যেমন—'পাণ্ডুক্ষামম্' ইত্যাদিতে। অথবা যেমন "কোপোৎকোমল লোলবাহুলতিকাপাশেন" ইত্যাদিতে। অঙ্গভাবপ্রাপ্তির এই আর এক প্রকার—যদি এক প্রধান বাক্যার্থ প্রস্তাবিত হয় বলিয়া তাহার মধ্যে দুই পরস্পরবিরোধী রস বা ভাব তাহার অঙ্গভূত হয় তাহা হইলেও কোন দোষ হয় না। যেমন "ক্ষিপ্তো হস্তাবলগ্নঃ" ইত্যাদিতে কথিত হইয়াছে। যদি জিজ্ঞাসা করা হয়, কেন সেইখানে বিরোধ হয় না, তদুত্তরে বলা যাইতে পারে, তাহারা দুইটিই অপরের অধীন বলিয়াই বিরোধ হয় না আবার যদি বলা হয় কেমন করিয়া অপরের অধীনতার জন্যই বিরোধী দুইটি রস বা ভাবের বিরোধের নিরসন হয়, তাহা হইলে উত্তর দেওয়া যাইতে পারে—মূল বিধিতে বিরোধীদের সমাবেশ হইলে দোষাবহ হয়। পরে বিধির অঙ্গ যে অনুবাদ বা সমর্থন তাহার মধ্যে বিরোধীদের সমাবেশে দোষ হয় না। যেমন—

"এস, যাও; নীচে পতিত হও, উপরে ; কথা বল, চুপ করিয়া থাক—এইভাবে ধনী ব্যক্তিরা প্রার্থীদিগকে লইয়া ক্রীড়া করে।" ইত্যাদিতে।

এই শ্লোকে যেমন কাজের যে নির্দেশ ও প্রতিষেধ দেওয়া হয় তাহা অপর বস্তুর অঙ্গহিসাবে সন্নিবেশিত হইয়াছে বলিয়া দোষের হয় না সেইরূপ এই প্রসঙ্গেও। এই শ্লোকে (ক্ষিপ্তঃ ইত্যাদিতে) ঈর্ষ্যাবিপ্রলম্ভশৃঙ্গার-বিষয়ক ও করুণবিষয়ক বস্তু—কোনটিই মূল বক্তব্য (বিধি) নহে। ত্রিপুরারি মহাদেবের প্রভাবাতিশয্যের বর্ণনাই বাক্যের মূল অর্থ এবং এই দুই বস্তু তাহার অঙ্গহিসাবেই অবস্থিত হইয়াছে। বিধি (মূল নির্দেশ) এবং অনুবাদ (সমর্থন)—এইরূপ ব্যবহার যে রসসমূহের প্রয়োজ্য নহে

তাহা বলা যায় না, কারণ রসসমূহ বাক্যের অর্থ হইতে পারে ইহা স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে। বাচ্যার্থ ও বাক্যার্থ—ইহাদের সম্পর্কে মূল বিধি ও অনুবাদের (সমর্থনের) অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া লওয়া হয়। রসসমূহ তাহাদের দ্বারাই আক্ষিপ্ত হয়; তাই রসসমূহ সম্পর্কে বিধি ও অনুবাদের অস্তিত্ব কে বাধা দিতে পারে? যে বাক্যার্থ বা বাচ্যার্থের দ্বারা রসাদি সাক্ষাৎভাবে কাব্যের বিষয়ীভূত হয় না বলিয়া স্বীকার করা হয় সেই সকল বাক্যার্থ ও বাচ্যার্থ রসসমূহের নিমিত্ত হইতে পারে ইহা অবশ্যই মানিতে হইবে। এইরূপে বিরোধী রসের সমাবেশ হইলেও এখানে কোন বিরোধ নাই। যেহেতু মূল বিধি ও তাহার সমর্থনমূলক যে সকল বিভাবাদি এখানে অঙ্গ হইয়া আছে তাহাদের জন্যই বিপ্রলম্ভ ও করুণ— এই দুই রসবস্তুর সৃষ্টি হইয়াছে এবং তাহাদের সহকারিতায় মূল বিধি অংশ হইতে ভাববিশেষের প্রতীতি উৎপন্ন হইতেছে, সেইজন্যই কোন বিরোধ নাই। পরস্পরবিরোধী দুই কারণের সহকারিতায় কার্য্যবিশেষের উৎপত্তি হয় ইহা দেখাই যায়। একই কারণ একই সঙ্গে দুই বিরুদ্ধ ফলোৎপাদনের হেতু হইলে তাহাতে বিরুদ্ধতা দোষ হয়; কিন্তু পরস্পর-বিরোধী দুই কারণের সহকারিতায় কোন বিরোধ নাই। যদি জিজ্ঞাসা করা হয় যে এবংবিধ বিরুদ্ধ বিষয় কেমন করিয়া অভিনয় করা যাইবে, তাহা হইলে বলিব যে বাচ্য অর্থে এইরূপ বিধি ও সমর্থনমূলক ব্যাপার থাকিলে যাহা করা হয় এইখানেও তাহাই কর্তব্য। এইভাবে এই বিষয়ে মূল বিধি ও তাহার সমর্থন-সম্পর্কিত নীতি প্রয়োগ করিয়া বিরোধের পরিহার করা হইল। অপিচ কোন নায়কের উদয় অভিনন্দনের বিষয় হইলে তাহার প্রভাবাতিশয্যের বর্ণনায় যদি তাহার বিপক্ষদলের সম্পর্কে করুণরসের অবতারণা করা হয় তাহা হইলে বিবেচনাশীল সহৃদয় ব্যক্তিদের হৃদয়ে কোন অশান্তির সৃষ্টি হয় না; বরং তজ্জন্য প্রীতির আতিশয্যই প্রতিপন্ন হয়।

এই কারণে বিরোধের উৎপাদক করুণরসের শক্তি ক্ষীণ হইয়া যায় বলিয়া কোন দোষ হয় না। সুতরাং যে রস বা ভাব বাক্যের মূল অর্থের বিরোধী তাহা রসবিরোধী ইহা বলা সঙ্গত; কিন্তু যাহা তাহার অঙ্গ তাহার সম্পর্কে এই যুক্তি খাটে না। আবার যদি কোন করুণরস বাক্যার্থের বিষয়ীভূত হয় তাহা হইলে ভঙ্গীবিশেষের আশ্রয়ের দ্বারা তাহাকে শৃঙ্গাররসের সঙ্গে সংযোজিত করিলে তাহাতে নিজের পরিপুষ্টিই হয়। যেহেতু যে সকল পদার্থ স্বভাবতঃ মধুর তাহারা শোচনীয়তা প্রাপ্ত হইলে পূর্ব্বাবস্থার বিলাসসমূহ স্মরণ করায় তাহারা অধিকতর শোকাবেশ উৎপাদন করে। যেমন—"এই সেই হাত যাহা কাঞ্চী তুলিয়া ধরিয়াছে, স্ফীত স্তন মর্দ্দন করিয়াছে, নাভি, উরু ও জঘন স্পর্শ করিয়াছে এবং কটিদেশের বসনগ্রন্থি মোচন করিয়াছে।" ইত্যাদিতে। সুতরাং এই শ্লোকে (ক্ষিপ্তো হস্তাবলগ্নঃ ইত্যাদিতে) শম্ভুর শরাগ্নি ত্রিপুর-যুবতীদের প্রতি সেইরূপ ব্যবহার করিয়াছে যেমন কোন কর্মী সদ্য অপরাধ করিয়া ব্যবহার করিয়া থাকে, এইভাবে বিচার করিলে তাহাও বিরোধশূন্যই হয়। সুতরাং যেমন যেমন ভাবে এখানে নিরূপণ করা হইতেছে এই শ্লোকে সেই সেই ভাবেই দোষের অভাব প্রমাণিত হইল। আবার এই ভাবেই—

"হে রাজন, অধুনা তোমার ভীত শত্রুস্ত্রীরা যেন আবার বিবাহের উদ্যোগ করিতেছে—তাহাদের পায়ের কোমল অঙ্গুলি হইতে রক্ত অলক্তকের ন্যায় ক্ষরিত হইতেছে, তাহাদের হাতে কুশগুচ্ছ। তাহারা স্বামীর হাত ধরিয়া বেদী পরিক্রমণ করিয়া অশ্রুধৌতবদনে দাবাগ্নির চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতেছে।"

এই সকল উদাহরণেই বিরোধশূন্যতার রহস্য বুঝিতে হইবে।

এইভাবে রসাদির সঙ্গে বিরোধী রসাদির সমাবেশ ও অসমাবেশের বিষয়-বিভাগ দর্শিত হইল। তাহারা একই প্রবন্ধে সন্নিবেশিত হইলে

তাহাদের মধ্যে পৌর্ব্বাপর্য্যক্রম থাকা সঙ্গত ; এখন তাহা প্রতিপাদন করার জন্য বলা হইতেছে—

**কাব্যপ্রবন্ধে নানা রসের সন্নিবেশ প্রসিদ্ধি লাভ করিলেও, যিনি তাহাদের উৎকর্ষ দেখাইতে চাহেন তিনি একটি রসকে অঙ্গী বা প্রধান করিবেন। ২১ ॥**

মহাকাব্য, নাটকাদি ও কাব্যপ্রবন্ধে বহু রস অঙ্গাঙ্গিভাবে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া সন্নিবেশিত হয়—এইরূপ প্রসিদ্ধি থাকিলেও যিনি কাব্য-প্রবন্ধে শোভাতিশয্য কামনা করেন তিনি সেই সকল রসের মধ্যে প্রস্তাবিত একটি রসকে অঙ্গী হিসাবে স্থাপিত করিবেন। এই মার্গই অধিকতর যুক্তিযুক্ত।

প্রশ্ন হইতে পারে অন্য বহু রস পরিপুষ্টি লাভ করিলে একটি রসের অঙ্গিত্বে বা প্রাধান্যে কি বিরোধ হয় না? এই আশঙ্কা করিয়া বলা হইতেছে—

**যে প্রস্তাবিত রস স্থায়ী বলিয়া প্রতিভাত হয় তাহার সঙ্গে অন্য রসের সমাবেশ করিলে তাহা ইহার অঙ্গিভাব বা প্রাধান্যকে নষ্ট করে না। ২২ ॥**

কাব্য প্রবন্ধে যে রস প্রথমে প্রস্তাবিত হইয়াছে এবং বারংবার অনুসন্ধানের ফলে যাহা স্থায়ী বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে, যাহা সকল সন্ধিতে ব্যাপ্ত হইয়া আছে তাহার মধ্যে ফাঁকে ফাঁকে অন্য রসেরযে সমাবেশ হয় তাহা ইহার প্রাধান্য বা অঙ্গিভাবকে নষ্ট করে না। ইহাই প্রতিপাদন করিবার জন্য বলা হইতেছে—

**যেমন একটি মূল ঘটনাই সমগ্র কাব্যপ্রবন্ধে ব্যাপ্ত হয় এইভাবে বিধান করা হয়, তেমনি করিয়া রসের বিধান করিলে কোন বিরোধ থাকিতেই পারে না। ২৩ ॥**

সন্ধিপ্রভৃতিসমন্বিত কাব্যপ্রবন্ধরূপ দেহের মধ্যে যেমন একই ঘটনা

পরিসমাপ্তি পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হয় এইরূপ কল্পনা করা হয়, তাহা যেমন অন্য ঘটনার সঙ্গে সম্মিশ্রিত হয় না এবং তাহাদের সঙ্গে সম্মিশ্রিত হইলেও তাহার প্রাধান্য যেমন হ্রাস পায় না, সেইরূপ একটি মূল রসের সঙ্গে অপর রস সন্নিবেশিত হইলে কোন বিরোধ হয় না। বরং যে সকল সুধী-ব্যক্তির বিবেচনা-বুদ্ধি জাগ্রত হইয়াছে এবং যাঁহারা কাব্যসম্পর্কে অনুসন্ধিৎসু তাঁহাদের সেইরূপ বিষয়ে অতিশয় আহ্লাদই হইয়া থাকে।

প্রশ্ন হইতে পারে, যে সকল রস পরস্পরবিরোধী নহে যেমন বীর ও শৃঙ্গার, শৃঙ্গার ও হাস্য, রৌদ্র ও শৃঙ্গার, বীর ও অদ্ভুত, বীর ও রৌদ্র, রৌদ্র ও করুণ অথবা শৃঙ্গার ও অদ্ভুত—তাহাদের মধ্যে অঙ্গাঙ্গিভাব হয় ত' হউক। যে সকল রসের মধ্যে পরস্পর-বাধ্যবাধক ভাব আছে তাহাদের মধ্যে অঙ্গাঙ্গি-সম্বন্ধ কেমন করিয়া থাকিবে? যেমন শৃঙ্গার ও বীভৎস রসের মধ্যে, বীর ও ভয়ানকের মধ্যে, শান্ত ও রৌদ্রের মধ্যে? এই আশঙ্কা করিয়া বলা হইতেছে—

**কোন একটি রসকে অঙ্গী করিয়া গ্রহণ করিলে অপর কোন রসের পরিপুষ্টি সাধন করিবে না, সেই অপর রস বিরোধীই হউক আর অবিরোধীই হউক। এইরূপ করিলে বিরোধ থাকে না। ২৪ ॥**

শৃঙ্গারাদি কোন একটি রস অঙ্গী অর্থাৎ কাব্যপ্রবন্ধের মূল ব্যঙ্গ্যবিষয় হইলে অপর কোন রসের পরিপুষ্টি সাধন করিতে হইবে না; সেই অপর রস প্রধান রসের বিরোধীই হউক আর অবিরোধীই হউক। সেইখানে অঙ্গী রসের তুলনায় দ্বিতীয় অবিরোধী রসের অত্যন্ত আধিক্য বা প্রাধান্য দিতে হইবে না। ইহা পরিপুষ্টির প্রথম পরিহার। ইহাদের সমপ্রাধান্য থাকিলেও বিরোধ সম্ভব হইবে না। যেমন—

"এক দিকে প্রিয়া রোদন করিতেছে; অপর দিকে সমরবাদ্যের

নির্ঘোষ। স্নেহরস ও রণরসে যোদ্ধার হৃদয় দোলায়িত হইতেছে” অথবা যেমন—

“দেবী পার্ব্বতী উপাসনাচ্ছলে অসূয়া প্রকাশ করিতে করিতে যেন পশুপতিকে উপহাস করিতেছেন এইরূপ দেখা গেল। তিনি কণ্ঠ হইতে হার খুলিয়া লইয়া অক্ষবলয়ের ন্যায় তাহা সঞ্চালন করিতে লাগিলেন; মেখলার সূত্রকে সর্পরাজ বাসুকি কল্পনা করিয়া ধ্যানোচিত আসনবিশেষ করিয়া লইলেন, মিথ্যা মন্ত্রের জপ করিতে যাইয়া তাঁহার স্ফুরিত অধরপুটে অব্যক্ত হাসি ব্যঞ্জিত হইল। সেই দেবী তোমাদিগকে রক্ষা করুন।” এইখানে।

প্রধান বা অঙ্গী রসের বিরুদ্ধে ব্যভিচারী ভাবের প্রাচুর্য্যের সহিত সন্নিবেশ না করা এবং সন্নিবেশ করিলেও তাহারা যাহাতে ক্ষিপ্রতার সহিত অঙ্গী রসের ব্যভিচারীদের অনুগমন করে তাহার ব্যবস্থা করা—ইহা পরিপুষ্টির দ্বিতীয় পরিহার। অঙ্গভূত যে রস তাহা পরিপুষ্টির দিকে অগ্রসর হইতে থাকিলেও যাহাতে তাহা অঙ্গরূপেই থাকে তৎপ্রতি পুনঃ পুনঃ দৃষ্টি দেওয়া—ইহা পরিপুষ্টির তৃতীয় পরিহার। এইভাবে অনুসন্ধান করিলে এই বিষয়ের অন্যান্য প্রকারও কল্পনা করা যাইতে পারে। যে কোন বিরোধী রস তাহা যাহাতে অঙ্গী রস অপেক্ষা ন্যূন থাকে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে, যেমন শান্তরস অঙ্গী হইলে শৃঙ্গারের অথবা শৃঙ্গাররস অঙ্গী হইলে শান্তের। যদি প্রশ্ন করা যায়, যে রস পরিপুষ্টি লাভ করে নাই তাহা কেমন করিয়া রসত্ব লাভ করে, তদুত্তরে বলিব, অঙ্গী রসের তুলনায় পরিপুষ্টি লাভ করে নাই, এই পর্য্যন্ত। যে রস অঙ্গী তাহার যতখানি পরিপুষ্টি হইবে, ইহার ততখানি হইবে না; কিন্তু যে পরিপুষ্টি আপনা হইতেই হইবে তাহাতে কে বাধা দিবে? যাঁহারা রসসমূহের অঙ্গাঙ্গিভাব মানেন না, বহুরস-সমন্বিত কাব্যপ্রবন্ধে একটি রসের যে আপেক্ষিক প্রকর্ষ হইতে পারে তাহা তাঁহারাও নিবারণ

করিতে পারেন না। সুতরাং এইভাবে প্রমাণিত হইল যে কাব্যপ্রবন্ধে অঙ্গাঙ্গিভাবে বিরোধী এবং অবিরোধী রসের সমাবেশ হইলে কোন বিরোধ হয় না। "এক রস অপর রসের ব্যভিচারী হইতে পারে"—ইহা যাঁহাদের মত তাঁহাদের যুক্তি অনুসারেই এই সকল কথা বলা হইল। এই প্রকারের অপর একটি মত আছে যে রসসমূহের স্থায়ী ভাবগুলিই উপচারের বলে রস বলিয়া কথিত হইয়াছে। এই মতানুসারে একটি রসের অঙ্গ হইতে পারে তাহাতে কোন বিরোধই থাকে না। কাব্যপ্রবন্ধস্থ একটি অঙ্গী বা প্রধান রসের সঙ্গে অপর বিরোধী বা অবিরোধী রসের সমাবেশ হইলে কেমন করিয়া ইহাদের সম্ভাবিত বিরোধের নিরসন করিতে হইবে তাহার উপায় এইরূপে সাধারণভাবে প্রতিপাদন করিয়া বিরোধী রসের সম্পর্কিত বিরোধ নিরসনের যে উপায় আছে তাহার কথা প্রতিপাদন করিবার জন্য ইহা বলা হইতেছে—

**যাহা স্থায়ী রসের সঙ্গে এক আশ্রয়ে থাকিলে স্থায়ী রসের বিরোধী হয় তাহাকে পৃথক্ আশ্রয়ে সন্নিবেশিত করিতে হইবে। সেইভাবে সন্নিবেশ করিয়া তাহার প্রতিপাদন পরিপুষ্টি বিধান করিলেও দোষ হয় না।২৫॥**

রস দুইভাবে অপর রসের বিরোধী হইতে পারে—এক আধারে থাকিয়া বিরোধী হইতে পারে অথবা ব্যবধান না রাখিয়া সন্নিবেশিত করিলে বিরোধী হইতে পারে। তন্মধ্যে যে রস কাব্যপ্রবন্ধে স্থায়ী ভাবে আছে তাহার সঙ্গে এক আশ্রয়ে যদি বিরুদ্ধ রসের সমাবেশ হয় তাহা হইলে ঔচিত্যের দিক্ দিয়া বিরোধের সৃষ্টি হয়—যেমন বীররসের সঙ্গে ভয়ানক রসের। এই বিরোধী রসকে পৃথক্ আশ্রয়ে সন্নিবেশিত করিতে হইবে। সেই বীররসের আশ্রয় যে নায়ক তাহার প্রতিপক্ষের মধ্যে ভয়ানক রসের সন্নিবেশ করিতে হইবে। এইরূপ ব্যবস্থা করিয়া যদি সেই বিরোধী রসেরও পরিপুষ্টি সাধন করা হয় তাহাও নির্দোষ

হয় প্রতিপক্ষে ভয়াতিশয্যের বর্ণনা করা হইল নায়কের নয়, পরাক্রম প্রভৃতি ঐশ্বর্য্য বিশেষভাবে প্রকাশিত হইয়া পড়ে। ইহা আমার অর্জ্জুনচরিতে অর্জ্জুনের পাতালে অবতরণের বর্ণনা প্রসঙ্গে বিশেষভাবে দেখান হইয়াছে।

এইভাবে এক আধারে থাকিলে যাহা কাব্যপ্রবন্ধস্থিত স্থায়ী রসের বিরোধী হয় তাহা স্থায়ী রসের অঙ্গত্বলাভ করিলে যে ভাবে বিরোধের নিরসন হয় তাহা দেখান হইয়াছে। দ্বিতীয়ের অর্থাৎ অব্যবধানে স্থাপিত রসের সম্পর্কে যে বিরোধ নিরসন হয় তাহা প্রতিপাদন করিবার জন্য বলা হইতেছে—

**এক আশ্রয়ে থাকিলে যাহা নির্দ্দোষ অথচ ব্যবধান না রাখিয়া সন্নিবেশিত হইলে যাহা বিরোধের উৎপাদন করে মেধাবী কবি মাঝখানে অন্য রসের দ্বারা ব্যবধান সৃষ্টি করিয়া তাহাকে ব্যঞ্জিত করিবেন। ২৬॥**

যাহা আবার এক আশ্রয়ে থাকিলে বিরোধী হয় না কিন্তু ব্যবধান না থাকিলে বিরোধী হয় তাহাকে কাব্যপ্রবন্ধে রসান্তরের ব্যবধানে সন্নিবেশিত করিতে হইবে। যেমন নাগানন্দে শান্তরস ও শৃঙ্গাররস সন্নিবেশিত হইয়াছে। তৃষ্ণার ক্ষয় হইতে যে সুখ হয় তাহার যে পরিপুষ্টি সেই লক্ষণযুক্ত রসের নাম শান্তরস; তাহা অবশ্যই প্রতীত হয়। এই মতের সমর্থনে এই উক্তি উদ্ধার করা যাইতে পারে—

"ভূলোকে অভীষ্টসাধনজনিত যে সুখ এবং স্বর্গে যে মহৎসুখ আছে—ইহারা আকাঙ্ক্ষার ক্ষয়জনিত সুখের ষোড়শাংশের একাংশও লাভ করিতে পারে না।"

যদিও ইহা সর্ব্বজনের অনুভবের বিষয় নহে তাহা হইলেও এই যুক্তির বলে কেহ অস্বীকার করিতে পারিবেন না যে ইহা অলোকসামান্য, মহান্ অনুভাবসমন্বিত চিত্তবৃত্তিবিশেষ। ইহাকে বীররসের অন্তর্ভূক্ত

করা সঙ্গত নহে, কারণ বীররস আত্মাভিমানযুক্ত বলিয়া ব্যবস্থাপিত হইয়াছে, অথচ অহঙ্কারনিরোধই শান্তরসের লক্ষণ। এবংবিধ পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও যদি ইহাদিগকে এক বলিয়া পরিকল্পনা করা হয় তবে বীররস ও রৌদ্ররসও এক হইয়া পড়িতে পারে। দয়াবীরাদি চিত্তবৃত্তিতে সর্বপ্রকার অহঙ্কার রহিত হইয়া যায় বলিয়া ইহারা শান্তরসেরই প্রভেদ বিশেষ; অন্যথা অর্থাৎ যদি ইহারা অহঙ্কারযুক্তই হইত তাহা হইলে ইহাদিগকে বীররসের প্রভেদ বলিয়া নির্দেশ করিলে কোন বিরোধ হইত না। সুতরাং ইহা প্রমাণিতই হইল যে শান্তরস বলিয়া রস আছে। কাব্যপ্রবন্ধে বিরোধী রস থাকিলেও যদি ব্যবধান সৃষ্টি করিয়া অন্য রসকে মাঝখানে রাখিয়া শান্তরসের সমাবেশ হয় তাহা হইলে আর বিরোধ থাকে না, যেমন নাগানন্দ প্রভৃতি প্রদর্শিত দৃষ্টান্তে। ইহাই নিশ্চিত করিয়া দেওয়ার জন্য বলা হইতেছে—

**দুইটি ( বিরোধী ) রস একবাক্যে থাকিলেও যদি তাহাদের মাঝখানে অন্য একটি রসের সমাবেশ করা হয় তাহা হইলে তাহাদের বিরোধের অবসান হয়। ২৭ ॥**

অন্য তৃতীয় রসের ব্যবধানের দ্বারা এক কাব্যপ্রবন্ধে অবস্থিত দুইটি রসের বিরোধতার নিরসন হয়। ইহাতে ভ্রান্তির কোন অবকাশ নাই, কারণ উক্ত নীতি অনুসারে একবাক্যস্থিত দুইটি রসের মধ্যে বিরোধিতা থাকে না। যেমন—

"তখন বীরেরা নিজেদের দেহ মাটিতে পতিত দেখিতে পাইলেন—সেই বীরেরা বিমানপালঙ্কে শায়িত, নবপারিজাতমালার রেণুতে তাঁহাদের বক্ষ সুবাসিত। তাঁহাদের বাহুদ্বয়ের অন্তরাল সুরাঙ্গনা কর্তৃক আলিঙ্গনপাশে আবদ্ধ, চন্দনবারিসিক্ত সুগন্ধি কল্পলতারূপ বস্ত্রের বীজনের দ্বারা তাঁহারা স্নিগ্ধ। এই ভূপতিত দেহগুলির প্রতি রমণীরা কৌতূহলে অঙ্গুলি নির্দেশ করিতেছে, ধূলিতে এই দেহগুলি আচ্ছন্ন, শৃগালেরা

ইহাদিগকে আলিঙ্গন করিতেছে, মাংসাশী গৃধ্র প্রভৃতি পক্ষীরা শোণিত-সিক্ত পক্ষের দ্বারা ইহাদের ব্যজন করিতেছে।" ইত্যাদিতে। এখানে শৃঙ্গার রস ও বীভৎস রসের অথবা তাহাদের অঙ্গের সমাবেশে বিরোধিতা নাই, কারণ মাঝখানে বীর রস আসিয়া ব্যবধানের সৃষ্টি করিতেছে।

**এই ভাবে বিরোধ ও অবিরোধ সর্ব্বত্র নিরূপণ করিতে হইবে। বিশেষতঃ শৃঙ্গারে, কারণ সকল রসের মধ্যে ইহাই সুকুমারতম। ২৮ ॥**

সহৃদয় ব্যক্তি কাব্য প্রবন্ধে অথবা মুক্তকাদি অন্যস্থানে উক্ত লক্ষণানুসারে সকল রসে বিরোধ এবং অবিরোধের নিরূপণ করিবেন —বিশেষ করিয়া শৃঙ্গারে। রতির পরিপুষ্টিই তাহার আত্মা এবং অল্প কারণেই রতির ধ্বংসের সম্ভাবনা থাকে। তাই ইহা অন্য রস অপেক্ষা সুকুমার এবং বিরোধী রসের ঈষৎ সমাবেশও ইহা সহ্য করিতে পারে না।

**সেই রসবিষয়েই কবি অতিশয় সাবধান হইবেন; তাহার মধ্যে ভুল হইলে তাহা শীঘ্রই লক্ষিত হয়। ২৯ ॥**

অন্য সকল রস অপেক্ষা সেই রস অধিক সৌকুমার্য্যযুক্ত হয় বলিয়া কবি তাহার সম্পর্কে অধিক প্রযত্নবান্ হইবেন। সেইখানে ভুল করিলে তিনি সহৃদয় সমাজে অতি শীঘ্র অবজ্ঞার পাত্র হইবেন। যেহেতু কমনীয়তার জন্য শৃঙ্গার রস সকল রসের মধ্যে প্রাধান্য পায় সেইজন্য সংসারী ব্যক্তিরা অতি অবশ্যই ইহা অনুভব করিতে পারে। ব্যাপার যখন এই :—

**শিষ্যব্যক্তিকে উন্মুখী করিতে যে কাব্যশোভার প্রয়োজন হয় তজ্জন্য যদি শৃঙ্গার রসের অঙ্গসমূহের মধ্যে শৃঙ্গার-বিরুদ্ধ রসের স্পর্শ হয় তাহা হইলে কোন দোষ হয় না। ৩০ ॥**

শৃঙ্গারের অঙ্গসমূহে শৃঙ্গারের বিরোধী রসের যে সংস্পর্শ তাহা যে কেবল অবিরোধের সংযোগেই দোষশূন্য হয় তাহা নহে, যেহেতু শিষ্যদিগকে উন্মুখী করিতে যে কাব্যশোভার দরকার হয় তাহার জন্যও ইহা দোষের কারণ হয় না। শৃঙ্গার রসের অঙ্গের দ্বারা শিষ্যেরা উন্মুখীকৃত হইলে তাঁহারা আনন্দে শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহণ করেন। শিষ্যজনের মঙ্গলের জন্যই মুনিরা সদাচার-উপদেশরূপ নাটকাদির আলাপের অবতারণা করিয়াছেন।

অধিকন্তু শৃঙ্গার সকল জনের মনোহরণ করিবার মত সৌন্দর্য্যসম্পন্ন; তাই কাব্যে তাহার অঙ্গের সমাবেশ শোভাতিশয্যের পোষকতা করে। এইভাবে বিচার করিলেও বিরোধী রসে শৃঙ্গার রসের অঙ্গের সমাবেশ বিরুদ্ধতা আনয়ন করে না। সেই জন্যও—"ইহা সত্য বটে যে রমণীরা মনোহারিণী, ধনৈশ্বর্য্য যে মনোরম তাহাও সত্য; কিন্তু মানুষের জীবনই মদোন্মত্ত রমণীর অপাঙ্গক্ষেপণের মত চঞ্চল।" ইত্যাদিতে রসবিরোধিতা-জনিত দোষ নাই।

**এইভাবে রসপ্রভৃতির বিরোধ ও অবিরোধের বিষয় জানিয়া সুকবি কাব্য রচনা করিলে কোথাও ভ্রমে পতিত হয়েন না। ৩১ ॥**

ইত্থং—এই প্রসঙ্গে কথিত প্রকারের দ্বারা। রসাদীনাং—রস, ভাব ও তাহাদের আভাস সমূহের। ইহাদের পরস্পরের বিরোধের এবং অবিরোধের বিষয় জানিয়া কাব্য-বিষয়ে অতিশয় প্রতিভাশালী সুকবি কাব্য রচনা করিলে কোথাও ভ্রমে পতিত হয়েন না।

এইভাবে রসাদিতে বিরোধ এবং অবিরোধের উপযোগিতা প্রতিপাদন করিয়া বিভাবাদি বাচ্য এবং সুপ্, তিঙ্ প্রভৃতি বাচক রসাদিবিষয়ে এই যে সকল ব্যঞ্জক ইহাদের নিরূপণের উপযোগিতাও প্রতিপাদন করা হইতেছে—

**বাচ্য এবং বাচক সমূহের ঔচিত্যের সহিত যোজনা করা—রসাদিবিষয়ে মহাকবির ইহা মুখ্য কাম্য। ৩২ ॥**

ইতিবৃত্তবৈশিষ্ট্যরূপ বাচ্য এবং তদ্বিষয়ক যে বাচক—রসাদিমূলক ঔচিত্য অনুসারে ইহাদের যে যোজনা তাহা মহাকবির মুখ্য কাম্য। ইহাই মহাকবির মুখ্যব্যাপার যে রসাদি সমূহকেই কাব্যের প্রধান বিষয় বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়া তাহার অভিব্যক্তির অনুকূল করিয়া তিনি শব্দ ও অর্থের বিন্যাস করিবেন। রসাদিকে মুখ্য করিয়া রচনা করিতে হইবে—ইহা ভরতের নাট্যশাস্ত্র প্রভৃতিতেও সুপ্রসিদ্ধই। ইহা প্রতিপাদন করিবার জন্য বলিতেছেন—

**রসাদির অনুকূল করিয়াই অর্থ ও শব্দের যে সমুচিত ব্যবহার তাহাই বৃত্তি; এই বৃত্তিগুলি দুই প্রকারের। ৩৩ ॥**

ব্যবহারই বৃত্তি বলিয়া কথিত হয়। তন্মধ্যে রসের অনুকূল বাচ্য (অর্থ) বিষয়েও যে সমুচিত ব্যবহার তাহা এই কৈশিকী প্রভৃতি বৃত্তি নামে খ্যাত। উপনাগরিকা প্রভৃতি বৃত্তি বাচককে আশ্রয় করিয়া অবস্থিত আছে। রসাদির তাৎপর্য্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া বৃত্তিগুলির সন্নিবেশ করিলে কাব্য নাটকের পরমাশ্চর্য্য শোভা হয়। দুই প্রকার বৃত্তিরই রসাদি প্রাণস্বরূপ। কিন্তু ইতিবৃত্তাদি কাব্যের শরীরস্থানীয়। কেহ কেহ এই বলিয়াছেন—"রসাদির সঙ্গে ইতিবৃত্তের ব্যবহার গুণীর সঙ্গে গুণের ব্যবহারের ন্যায়; ইহা প্রাণের সঙ্গে শরীরের ব্যবহারের ন্যায় নহে। বাচ্য অর্থ রসাদিতে তন্ময় হইয়া প্রকাশিত হয়। পৃথক্ ভাবে রসাদির দ্বারা প্রকাশিত হয় না।" এই প্রসঙ্গে বলা হইতেছে—শরীর যেমন গৌরত্বময় বাচ্য অর্থও যদি সেইরূপ রসাদিময় হইত তাহা হইলে যেমন শরীর প্রকাশিত হইলেই গুণী ও গুণের ধর্ম্ম অনুসারে গৌরত্বও অবশ্যই সকলের কাছে প্রকাশিত হয়, সেইরূপ বাচ্য অর্থের প্রতীতির সঙ্গে সঙ্গেই রসাদিও সহৃদয় সকলের কাছে প্রতিভাত

হইবে। কিন্তু এইরূপ তো হয় না; ইহাও প্রথম উদ্দ্যোতে প্রতিপাদন করিয়া দেখানই হইয়াছে। এইরূপ একটি মত থাকিতে পারে—রত্ন-সমূহের উৎকৃষ্ট রূপশালিতা কোন বিশেষ বোদ্ধা ব্যক্তিই উপলব্ধি করিতে পারেন। সেইরূপ বাচ্য অর্থের রসাদিরূপত্বও সহৃদয় ব্যক্তিই জানিতে পারেন। ইহা ঠিক নহে; কারণ রত্নের উৎকৃষ্টতা প্রতিভাত হইলে ইহাও দেখা যায় যে সেই উৎকৃষ্টত্ব রত্নের স্বরূপ হইতে পৃথক্ নহে। যদি রসাদি রত্নের উৎকৃষ্টত্বের মত হইত তাহা হইলে রসাদিও বিভাব-অনুভাব রূপ বাচ্য বিষয় হইতে অনতিরিক্ত হইত। কিন্তু সেইরূপও হয় না। বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারীরাই রস—এইরূপ কাহারও প্রতীতি হয় না। যেহেতু বিভাবাদির প্রতীতি হইলেই রসাদির প্রতীতি হয়, সেই জন্য এই উভয় প্রতীতির মধ্যে কার্য্যকারণ ভাব থাকায় পৌর্ব্বাপর্য্য ক্রম অবশ্যই থাকিবে। সেই ক্রম খুব অল্প বলিয়া লক্ষিত হয় না; তাই বলা হইয়াছে পৌর্ব্বাপর্য্যক্রম লক্ষিত না করিয়াই রসাদি ব্যঙ্গ্য হয়। আপত্তি হইতে পারে—শব্দই প্রকরণ (প্রসঙ্গ) প্রভৃতির সঙ্গে যুক্ত হইয়া একই সঙ্গে বাচ্য ও ব্যঙ্গ্যের প্রতীতি জন্মায়; সুতরাং সেইখানে পৌর্ব্বাপর্য্যক্রমে কল্পনা করিয়া কি লাভ হইবে? শব্দের বাচ্য অর্থের জ্ঞানই ব্যঞ্জকত্বের কারণ নহে; যেহেতু সঙ্গীত প্রভৃতির শব্দ হইতেও রসাভিব্যক্তি হয়। গীতাদি শব্দ ও তাহাদের ব্যঞ্জকত্ব—ইহাদের মাঝখানে বাচ্য অর্থের উপলব্ধি হয় না।

এই প্রসঙ্গেও বলিতেছি—শব্দসমূহের ব্যঞ্জকত্ব যে প্রকরণ প্রভৃতির সঙ্গে ওতঃপ্রোতভাবে জড়াইয়া আছে তাহা আমাদের মত-সঙ্গতই। কিন্তু তাহাদের সেই ব্যঞ্জকত্ব কখনও স্বরূপের বৈশিষ্ট্যের জন্য হইয়া থাকে, কখনও বাচক শক্তির জন্য হইয়া থাকে। তন্মধ্যে যে সকল শব্দের বাচকশক্তির জন্য ব্যঞ্জকত্ব হইয়া থাকে সেইখানে তাহাদের বাচ্য অর্থের প্রতীতি ছাড়াই শব্দের স্বরূপের প্রতীতির দ্বারা যদি ব্যঞ্জকত্ব নিষ্পন্ন হয়

তাহা হইলে সেই ব্যঞ্জকত্ব শব্দের বাচকত্ব শক্তির জন্যই হইয়াছে এমন কথা বলা যায় না। যদি ব্যঞ্জকত্ব বাচকত্ব শক্তির জন্যই নিষ্পন্ন হয়, তাহা হইলে অতি অবশ্যই মানিতে হয় যে বাচ্যবাচকভাবের প্রতীতির পর ব্যঙ্গ্যার্থের প্রতীতি হয়। এই যে পৌর্ব্বাপর্য্যক্রম ইহা খুব ক্ষণস্থায়ী বলিয়া অনেক সময় যদি লক্ষিত না হয় তাহা হইলে কি করা যাইতে পারে? যদি বাচ্য অর্থের প্রতীতি ছাড়াই শুধু প্রকরণের (প্রসঙ্গের) সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কে সম্বদ্ধ শব্দের দ্বারাই রসাদির প্রতীতি উৎপন্ন হয় তাহা হইলে যে সকল বোদ্ধা ব্যক্তি নিজেরা বাচ্য ও বাচকের সম্বন্ধ জানেন না, যাঁহারা শব্দের প্রসঙ্গ ভাল করিয়া অবধারণ করিয়া দেখেন নাই, তাঁহাদেরও শব্দ শুনিবামাত্রই ব্যঙ্গ্যের প্রতীতি হইবে। যদি বাচ্য অর্থ ও ব্যঙ্গ্য অর্থ একই সঙ্গে উৎপন্ন হইয়া থাকে তাহা হইলে বাচ্যপ্রতীতি যে রসাদি-প্রতীতির নিমিত্তস্বরূপ সেই উপযোগিতা থাকিলে তাহারা একই সঙ্গে উৎপন্ন হইতে পারে না। গীতাদিশব্দের ন্যায় যে সকল শব্দের স্বরূপের বৈশিষ্ট্যের প্রতীতির জন্যই ব্যঞ্জকত্বের সৃষ্টি হয় তাহাদেরও স্বরূপের প্রতীতি এবং ব্যঞ্জকত্বের প্রতীতি—ইহাদের মধ্যে পৌর্ব্বাপর্য্যক্রম অবশ্যই থাকে। যে রসাদি বাচ্য অর্থের বিরোধী নহে, যাহা বাচ্যার্থ বিশেষ হইতে পৃথক্, তাহার মধ্যে শব্দের সেই ক্রিয়া-পৌর্ব্বাপর্য্যক্রম লক্ষিত হয় না, কারণ তন্মধ্যে যে সকল শব্দ-সংঘটনা থাকে তাহারা রসাদিপ্রতীতিরূপ ফল আনয়ন করে; ঐ সকল শব্দ-সংঘটনা নিজের বিষয় ছাড়া অন্য কিছু প্রকাশ করিতে পারে না এবং সেইখানে বাচ্যপ্রতীতির অপেক্ষা না করিয়াই অতি শীঘ্র রসাদির উপলব্ধি করা হয়; কোন কোন জায়গায় কিন্তু এই ক্রম লক্ষিতই হয়। যেমন অনুরণনরূপ ব্যঙ্গ্যের প্রতীতিতে। যদি প্রশ্ন করা যায়, সেইখানেই বা কি করিয়া লক্ষিত হয়, তদুত্তরে বলা হইতেছে—

অর্থশক্তিমূলক অনুরণনরূপব্যঙ্গ্যধ্বনিতে অভিধেয় বা বাচ্য অর্থ এবং তাহার সামর্থ্যের দ্বারা আক্ষিপ্ত ব্যঙ্গ্য অর্থ অত্যন্ত বিভিন্ন হইয়া থাকে,

কারণ এই যে বাচ্য অর্থ অন্য বাচ্য অর্থ হইতে পৃথক, তাহার প্রতীতির দ্বারাই ব্যঙ্গ্য অর্থের প্রতীতি হয় এবং এই দুইটি প্রতীতি একে অপর হইতে অতিশয় বিভিন্ন। সুতরাং বাচ্য অর্থ এবং ব্যঙ্গ্য অর্থের মধ্যে যে নিমিত্ত-নৈমিত্তিক ভাব আছে তাহার অপলাপ করা যায় না; এইভাবে সেইখানে পৌর্ব্বাপর্য্যক্রম স্ফুট হইয়াই প্রকাশিত হয়। প্রথম উদ্দ্যোতে প্রতীয়মান অর্থের অস্তিত্ব প্রমাণ করিতে যে সকল গাথা উদাহৃত হইয়াছে তাহাদের মধ্যে ইহার প্রমাণ আছে। সেই সকল স্থানে বাচ্যের প্রতীতি ব্যঙ্গ্যের প্রতীতি হইতে অতিশয় বিভিন্ন; তাই সেইখানে ইহা বলা সম্ভব নহে যে যাহা বাচ্যপ্রতীতি তাহাই ব্যঙ্গ্যপ্রতীতি, কিন্তু "গাবো বঃ পাবনানাং পরমপরিমিতাং প্রীতিমুৎপাদয়ন্তু" ইত্যাদি শব্দশক্তিমূলক অনুরণনরূপ ব্যঙ্গ্যধ্বনি স্থলে দুইটি ভাবের প্রতীতি সাক্ষাৎভাবে শব্দগ্রাহ্য হইয়াছে; 'যথা', 'ইব' প্রভৃতি উপমাবাচক শব্দ না থাকায় বাচ্য ও ব্যঙ্গ্যের মধ্যে যে "উপমান-উপমেয়' ভাব আছে তাহা অর্থের সামর্থ্যের দ্বারা আক্ষিপ্ত হইয়াছে। সেইখানেও বাচ্য অলঙ্কার এবং ব্যঙ্গ্য অলঙ্কারের প্রতীতির পৌর্ব্বাপর্য্যক্রম সহজেই লক্ষ্য হয়।

যে শব্দশক্তিমূলক অনুরণনরূপব্যঙ্গ্যধ্বনি পদের দ্বারা প্রকাশিত হয় তাহার মধ্যেও যে বিশেষণ পদ উভয় অর্থ বুঝাইতে পারে 'যথা', 'ইব' প্রভৃতি যোজকপদের ব্যতিরেকে সেই বিশেষণের যোজনা শব্দের দ্বারা নিষ্পন্ন না হইলেও অর্থের শক্তিবলেই উপলব্ধির বিষয় হয়। সেইজন্য পূর্ব্ববৎ এইখানেও বাচ্য অলঙ্কার এবং তাহার সামর্থ্যের দ্বারা আক্ষিপ্ত ব্যঙ্গ্য অলঙ্কারের প্রতীতির মধ্যে যে পৌর্ব্বাপর্য্যক্রম আছে তাহা সুপ্রমাণিতই হইল। এই উপলব্ধি অর্থ হইতে উৎপন্ন হইলেও যেহেতু তথাবিধ বিষয়ে ইহা উভয়ার্থসম্বন্ধবোধক শব্দের সামর্থ্যের দ্বারা নিষ্পন্ন হইয়াছে তাই ইহা শব্দশক্তিমূলক বলিয়া কল্পিত হয়। অবিবক্ষিত-বাচ্যধ্বনিতে বাচ্য অর্থের নিজের যে প্রসিদ্ধ বিষয় আছে তাহার প্রতি

বিমুখতার পরই অর্থান্তরের প্রকাশ হয়। তাই পৌর্ব্বাপর্য্যক্রম অবশ্যম্ভাবী। সেইখানে বাচ্য বিবক্ষিত হয় না বলিয়া বাচ্যের প্রতীতির সঙ্গে ব্যঙ্গ্যের প্রতীতির পৌর্ব্বাপর্য্যক্রমের বিচার করা হইল না। সুতরাং যেমন অভিধানের (শব্দের) প্রতীতি এবং অভিধেয় (বাচ্য) অর্থের প্রতীতির মধ্যে নিমিত্ত-নৈমিত্তিক ভাব আছে বলিয়া ক্রম অবশ্যম্ভাবী হয় সেইরূপ বাচ্যপ্রতীতি ও ব্যঙ্গ্যপ্রতীতির মধ্যেও পৌর্ব্বাপর্য্যক্রম অবশ্যই থাকে। উপরি-উক্ত যুক্তির দ্বারা দেখা যায় সেই ক্রম কখনও লক্ষিত হয়, কখনও লক্ষিত হয় না। এইভাবে ব্যঞ্জকমার্গ অনুসরণ করিয়া ধ্বনির প্রকার নিরূপিত হওয়ায় কেহ বলিবেন—এই ব্যঞ্জকত্ব আবার কি পদার্থ? যদি বলা হয় ইহা ব্যঙ্গ্য অর্থ প্রকাশের সামর্থ্য তবে পূর্ব্বপক্ষী উত্তর করিবেন, অর্থের যাহা ব্যঞ্জকত্ব তাহা ব্যঙ্গ্যত্ব হইতে পারে না। ব্যঙ্গ্যত্বের সিদ্ধি ব্যঞ্জকত্বের সিদ্ধির উপরই নির্ভর করে; আবার ব্যঙ্গ্যের উপরে নির্ভর করে বলিয়াই ব্যঞ্জকের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়। সুতরাং এখানে অন্যোন্য-সংশ্রয় বা উভয়ের মধ্যে পারস্পরিক নির্ভরশীলতা থাকে বলিয়া অব্যবস্থা-দোষ হইয়াছে। পূর্ব্বপক্ষীর এই যুক্তির উত্তরে বলা হইতেছে—আচ্ছা, বাচ্যের অতিরিক্ত যে ব্যঙ্গ্য আছে তাহার প্রমাণ পূর্ব্বেই দেওয়া হইয়াছে। তাহার সিদ্ধির উপরে ব্যঞ্জকের অস্তিত্বের প্রমাণ নির্ভর করে—ইহাতে প্রশ্নের অবকাশ কোথায়? পূর্ব্বপক্ষী বলিতে পারেন, ইহা সত্য বটে পূর্ব্বকথিত যুক্তিসমূহের বলে বাচ্য অর্থের অতিরিক্ত বস্তুর অস্তিত্ব প্রমাণিত হইয়াছে; তাহাকে ব্যঙ্গ্য বলিয়া উল্লেখ করা হয় কেন? যেখানে উহা প্রধানভাবে থাকে সেইখানে উহার বাচ্যরূপে নামকরণ করাই সঙ্গত, কারণ যাহার অধীন হইয়া বাক্য থাকে তাহাই বাক্যের অর্থ। অতএব যাহাকে ব্যঙ্গ্য অর্থ বলা হয় তাহার প্রকাশক বাক্যার্থ বাচকত্বেরই ব্যাপার। তাহার অন্য ব্যাপার কল্পনা করিয়া লাভ কি? সুতরাং তাৎপর্য্যবিষয়ক যে অর্থ তাহাই মুখ্যভাবে বাচ্য। তথাবিধ বিষয়ে

মাঝখানে যে অন্য বাচ্য অর্থের প্রতীতি হয় তাহা পূর্ব্বোক্ত বাচ্যার্থের প্রতীতির উপায় মাত্র। যেমন পদের অর্থের প্রতীতির উপায়ে বাক্যের অর্থের প্রতীতি হয় এইখানেও সেইরূপ। পূর্ব্বপক্ষীর এই যুক্তির উত্তরে বলা হইতেছে—যেখানে শব্দ নিজের অর্থকে অভিহিত করিয়া অন্য অর্থকে বোঝায় সেইখানে তাহার নিজের অর্থ অভিহিত করার ব্যাপার এবং তাহা যে অন্য অর্থ বুঝাইবার হেতু হয়—ইহারা একই ব্যাপার হইবে অথবা বিভিন্ন ব্যাপার হইবে। ইহারা এক হইতে পারে না, কারণ ইহাদের বিষয়ের বিভিন্নতা অবশ্যই প্রতীত হয়। তাই শব্দের যে বাচকত্ব ব্যাপার তাহা নিজের অর্থ সম্পর্কিত; আর তাহার যে গমকত্ব বা বোধকত্ব-লক্ষণযুক্ত ব্যাপার তাহা অপর অর্থের বিষয় সম্পর্কিত। বাচ্যকে 'স্ব'-পদার্থের বা স্বার্থের দ্বারা এবং ব্যঙ্গ্যকে অপর পদার্থের দ্বারা যে নির্দ্দেশ করা হয় তাহাকে আশ্রয় করিয়া বাচ্য ও ব্যঙ্গ্যের মধ্যে যে প্রভেদের সৃষ্টি হয় কিছুতেই তাহার অপলাপ করা যায় না। একটির (বাচ্যের) প্রতীতি হয় শব্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ সম্বন্ধের দ্বারা, অপরটির প্রতীতি হয় সেই সম্বন্ধযুক্ত অর্থের সঙ্গে অন্য সম্বন্ধের যোজনা করিয়া। বাচ্য যে অর্থ তাহা শব্দের সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে সম্পর্কিত; তদতিরিক্ত যে অর্থ তাহা বাচ্যের সামর্থ্যের দ্বারা আক্ষিপ্ত হয় বলিয়া তাহা সম্পর্কান্বিতের সঙ্গে সম্পর্কান্বিত। যদি সেই অপর অর্থ সাক্ষাৎভাবে শব্দের সঙ্গে সম্বদ্ধ হয় তাহা হইলে অন্য অর্থ বুঝাইতে তাহার ব্যবহার হইতেই পারে না। সুতরাং এই দুই ব্যাপারের বিষয়ের পার্থক্য সুপ্রসিদ্ধই; ইহাদের আকারের (রূপের) পার্থক্যও প্রসিদ্ধই বটে। যাহাই অভিধানশক্তি তাহাই অবগমন বা বোধন শক্তি নহে। কারণ বাচকত্ব শক্তিহীন।

গীতাদি শব্দের দ্বারাও রসাদিলক্ষণযুক্ত অর্থ বোঝান হয় ইহা দেখা যায় এবং শব্দহীন প্রচেষ্টাদিও অর্থবৈশিষ্ট্য প্রকাশ করিতে পারে এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে। তাই "ব্রীড়াযোগান্নতবদনয়া" ইত্যাদি শ্লোকে

সুকবি অঙ্গভঙ্গিরূপ প্রচেষ্টাকে অর্থ প্রকাশের হেতু বলিয়াই দেখাইয়াছেন। সুতরাং শব্দের নিজের অভিধাব্যাপার এবং তাহার অন্য অর্থ বুঝাইবার নিমিত্ত হওয়ার শক্তি—ইহাদের ভেদ বিষয়ের পার্থক্যের জন্য এবং আকারের (রূপের) পার্থক্যের জন্য স্পষ্টতঃই দেখা যাইতেছে। যদি স্বীকার করা যায় যে এই দুই ব্যাপারের মধ্যে পার্থক্য আছে তাহা হইলে যে অবগমন বা বোধনশক্তি বাচ্য অর্থের সামর্থ্যের দ্বারা অন্য অর্থ বোঝায় তাহাকে বাচ্যত্ব বলিয়া নির্দেশ করা যায় না। ইহা যে শব্দের ব্যাপারের অন্তর্গত তাহা আমাদেরও অভিপ্রেত, কিন্তু তাহা ব্যঙ্গ্যত্বের দ্বারা নিষ্পন্ন হয়, বাচ্যত্বের দ্বারা নহে। শব্দ তাহার বাচ্য অর্থের সামর্থ্যের দ্বারা বাচ্য অর্থের সম্বন্ধযোগ্য করিয়া অন্য অর্থের প্রতীতি জন্মায়—এই প্রতীতিকে যদি স্বার্থবাচক অন্য কোন শব্দের বিষয়ীভূত করা যায় তবে সেই স্থলে ইহাকে পূর্ব্বোক্ত শব্দের প্রকাশন বলাই যুক্তিযুক্ত। পদের অর্থ এবং বাক্যের অর্থের মধ্যে যে সম্বন্ধ থাকে বাচ্য ও ব্যঙ্গ্যের সম্পর্ক সেইরূপ নহে; যেহেতু কোন কোন পণ্ডিত ব্যক্তিরা মনে করেন যে পদের অর্থের কোন পারমার্থিক সত্যতা বা স্থিরতা নাই। যাঁহারা পদের অর্থের অস্থিরতা বা অসত্যতা স্বীকার না করেন তাঁহারাও মনে করেন যে ঘট ও তাহার উপাদানের মধ্যে যেরূপ সম্বন্ধ আছে পদের অর্থ ও বাক্যের অর্থের মধ্যেও সেইরূপ সম্বন্ধই মানিয়া লইতে হইবে। যেমন ঘট নিষ্পন্ন হইলে যে সমস্ত উপাদানের দ্বারা তাহা নিষ্পন্ন হয় সেই সমস্ত উপাদানরূপ কারণ আর পৃথক্‌ভাবে উপলব্ধির বিষয় হয় না সেইরূপ বাক্য বা তাহার অর্থের প্রতীতি হইলে যদি পদ এবং তাহার অর্থের পৃথক্‌ভাবে উপলব্ধি হইতে হয় তাহা হইলে বাক্যার্থের বোধই দূরীভূত হইবে। বাচ্য ও ব্যঙ্গ্যের সম্পর্কে এই নিয়ম প্রযোজ্য নহে, ব্যঙ্গ্য প্রতীয়মান হইলে বাচ্য অর্থের বুদ্ধি দূরীভূত হয় না, কারণ বাচ্যের প্রকাশের সঙ্গে একত্র হইয়াই তাহারও

প্রকাশ হয়। সুতরাং বাচ্য ও ব্যঙ্গ্যের মধ্যে যে সম্পর্ক তাহা ঘট ও প্রদীপের মধ্যস্থিত সম্পর্কের মত; যেমন প্রদীপের দ্বারা ঘটের প্রতীতি উৎপন্ন হইলে প্রদীপের প্রকাশ শেষ হইয়া যায় না সেইরূপ ব্যঙ্গ্যের প্রতীতি জন্মাইলে বাচ্যের প্রতীতির অবসান হয় না। প্রথম উদ্দ্যোতে যে বলা হইয়াছে "যথা পদার্থদ্বারেণ" ইত্যাদি (১।১০) তাহার উদ্দেশ্য কেবল এই যে একটি বস্তু (পদের অর্থ—বাচ্য অর্থ) অপর বস্তুর (বাক্যের অর্থ—ব্যঙ্গ্য) উপায়স্বরূপ। আপত্তি হইতে পারে যে এই ভাবে বাক্যের একই সঙ্গে দুইটি অর্থ বুঝাইবার উপযোগিতা থাকিলে, তাহার বাক্যত্বই নষ্ট হইয়া যাইবে, যেহেতু বাক্যের লক্ষণই এই যে তাহা একার্থবোধক। ইহা দোষের নহে কারণ অর্থ দুইটি প্রধান ও অপ্রধানভাবে থাকে। কোথাও ব্যঙ্গ্য অর্থ প্রাধান্য পায়, এবং বাচ্য অর্থ গৌণ হয়। আবার কোথাও বাচ্য প্রধান হয় এবং ব্যঙ্গ্য অপ্রধান হয়। তন্মধ্যে ব্যঙ্গ্যের প্রাধান্য থাকিলে তাহাকে যে ধ্বনি বলা হয় তাহা কথিতই হইয়াছে; বাচ্যের প্রাধান্য হইলে অন্য এক প্রকারের উদ্ভব হয় তাহার নির্দেশ পরে দেওয়া হইবে। সুতরাং ইহা নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত হইল—কাব্যে যেখানে ব্যঙ্গ্য অর্থ প্রাধান্য পায় সেইখানে কাব্য অভিধেয় না হইয়া ব্যঙ্গ্যই হইয়া থাকে।

অপিচ, ব্যঙ্গ্য অর্থ প্রধানভাবে বিবক্ষিত না হইলে তাহাকে বাচ্য অর্থ বলিয়া আপনারা স্বীকার করিবেন না, কারণ আপনাদের মতে শব্দ যে অর্থ প্রধানভাবে প্রকাশ করে সেই অর্থই বাচ্য অর্থ। তাই শব্দের ব্যঙ্গ্য অর্থ বলিয়া একটি বিষয় আছে ইহা মানিতেই হইবে। যেখানে তাহার প্রাধান্য সেইখানেই তাহার স্বরূপের অপলাপ করা কেমন করিয়া সম্ভব হইবে? এইরূপে ব্যঞ্জকত্ব বাচকত্ব হইতে বিভিন্ন হইল। ইহাও তাহাদের পার্থক্যের অন্যতম কারণ যে বাচকত্ব শুধু শব্দকে আশ্রয় করিয়া থাকে, ব্যঞ্জকত্ব শব্দ ও অর্থ উভয়কে আশ্রয় করে।

শব্দ ও অর্থের উভয়ের ব্যঞ্জকত্বই প্রতিপাদিত হইয়াছে। অবশ্য উপচার এবং লক্ষণার দ্বারা গৌণীবৃত্তিও শব্দ ও অর্থ উভয়কে আশ্রয় করে। কিন্তু সেইখানেও ব্যঞ্জকত্বের আকারের (স্বরূপের) এবং বিষয়ের পার্থক্য লক্ষিত হইয়া থাকে। আকারের পার্থক্য তো এই—গৌণীবৃত্তি শব্দের অপ্রধান ব্যাপার ইহা প্রসিদ্ধ, কিন্তু ব্যঞ্জকত্ব প্রধানভাবেই শব্দের ব্যাপার হইয়া থাকে। অর্থ হইতে যে তিন প্রকারের ব্যঙ্গ্য উৎপন্ন হয় তাহার ঈষৎ অপ্রধানত্বও দেখা যায় না। আকারের আর একটি ভেদ এই—গৌণীবৃত্তি অপ্রধানভাবে অবস্থিত থাকিয়া বাচকত্ব বলিয়াই কথিত হয়। কিন্তু বাচকত্ব হইতে ব্যঞ্জকত্বের পার্থক্য খুবই বেশী—ইহাও পূর্ব্বেই প্রতিপাদিত হইয়াছে। আকারের দিক দিয়া আরও একটি প্রভেদ এই যে গৌণীবৃত্তি যখন মুখ্য অর্থ হইতে পৃথক্ অপর একটি অর্থকে উপলক্ষিত করে তখন শব্দের মুখ্য অর্থ লক্ষিত অর্থের মধ্যে মিশিয়া যায় বলিয়াই লক্ষণা সম্পাদিত হয়। যেমন "গঙ্গায়াং ঘোষবসতি" ইত্যাদিতে। ব্যঞ্জকত্বমার্গে যখন এক অর্থ অন্য অর্থের দ্যোতনা করে তখন প্রদীপের মত বাচ্য অর্থ নিজের স্বরূপকে প্রকাশিত করিয়াই অন্যের প্রকাশক বলিয়া প্রতীত হয়। যেমন—"লীলাকমল-পত্রাণি গণয়ামাস পার্ব্বতী" ইত্যাদিতে। যেখানে অর্থ নিজের প্রতীতিকে আচ্ছন্ন না করিয়াই অন্য অর্থকে লক্ষিত করে সেইখানে যদি লক্ষণার ব্যবহার করা হয় তাহা হইলে লক্ষণাই শব্দের মুখ্য ব্যাপার হইয়া দাঁড়ায়, কারণ প্রায়ই বাক্যসমূহ বাচ্য অর্থের অতিরিক্ত অন্য তাৎপর্য্য প্রকাশ করে।

প্রশ্ন হইতে পারে—তোমার মতানুসারেও যখন অর্থ তিন প্রকারের ব্যঙ্গ্য প্রকাশ করে তখন শব্দের আবার কি ব্যাপার হইয়া থাকে? উত্তরে বলা হইতেছে—প্রকরণাদির সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কে জড়িত শব্দের সহকারিতাবশেই অর্থ ব্যঞ্জকত্ব লাভ করে; সুতরাং সেইখানে কেমন

করিয়া শব্দের উপযোগিতার অপলাপ করা যাইবে? গে
ব্যঞ্জকত্বের বিষয়ভেদ স্পষ্টই, যেহেতু ব্যঞ্জকত্বের তিনটি বিষয় আছে
—রসাদি, অলঙ্কারবৈশিষ্ট্য ও ব্যঙ্গ্যস্বরূপের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত
বস্তু। তন্মধ্যে রসাদির প্রতীতি গৌণীবৃত্তির অন্তর্ভূত, ইহা কেহ বলেনও
নাই, কেহ বলিতে পারেনও না। ব্যঙ্গ্য অলঙ্কারের প্রতীতি সম্পর্কেই
সেই কথা বলা যাইতে পারে। বস্তুর চারুত্বের প্রতীতি জন্মাইবার জন্য
বক্তার যে অর্থ প্রতিপাদন করিবার ইচ্ছা হয়, যাহা স্ববোধক শব্দের
(স্বশব্দের) দ্বারা বোঝান যায় না তাহাই ব্যঙ্গ্য অর্থ। এই ব্যঙ্গ্য অর্থ
সম্যক্‌রূপে গৌণীবৃত্তির বিষয় নহে, কারণ ইহা দেখা যায় যে প্রসিদ্ধি
ও বিশেষ প্রয়োজন বুঝাইবার জন্যও গৌণ অর্থে শব্দসমূহের প্রয়োগ
হয় ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। চারুত্বপ্রতীতির যেটুকুমাত্র গৌণীবৃত্তির
বিষয় তাহাও ব্যঞ্জকত্বের অনুপ্রবেশের জন্যই হইয়া থাকে। সুতরাং
গৌণীবৃত্তি হইতেও ব্যঞ্জকত্ব একেবারে পৃথক্‌। বাচকত্ব ও গুণবৃত্তি
হইতে বিভিন্ন হইলেও তাহা ইহাদের উভয়কেই আশ্রয় করিয়া অবস্থিত
থাকে। ব্যঞ্জকত্ব কোথাও কোথাও বাচকত্বকে আশ্রয় করিয়া অধিষ্ঠিত
থাকে, যেমন বিবক্ষিতান্যপরবাচ্যধ্বনিতে। কোথাও বা গৌণীবৃত্তিকে
আশ্রয় করিয়া থাকে, যেমন অবিবক্ষিতবাচ্যধ্বনিতে। তাহাদের
উভয়ের আশ্রয়ত্ব প্রতিপাদন করিবার জন্যই প্রথমে ধ্বনির দুই প্রভেদ
উপন্যস্ত হইয়াছে। ধ্বনি তাহাদের উভয় রূপকেই আশ্রয় করে বলিয়া
ইহা তাহাদের যে কোন একটির সঙ্গে একাত্মক এইরূপ বলা যায় না।
তাহা বাচকত্বের সঙ্গে একাত্মক হইতে পারে না, কারণ তাহা কোথাও
লক্ষণার আশ্রয়েও থাকে, আবার লক্ষণার সঙ্গেও তাহাকে একাত্মক
বলিয়া বলা যায় না, কারণ অন্য জায়গায় তাহা বাচকত্বকে আশ্রয়
করিয়া থাকে। শুধু উভয়ের ধর্ম্মকে গ্রহণ করে বলিয়াই যে ইহা কোন্‌
একটির সঙ্গে একাত্মক হয় না তাহা নহে, যেহেতু বাচকা

শব্দের ধর্ম্মের দ্বারাও ব্যঞ্জকত্বের প্রকাশ হয়। তদনুসারেই সংগীতের ধ্বনিসমূহেরও রসাদিবিষয়ে ব্যঞ্জকত্ব আছে। তাহাদের মধ্যে বাচকত্ব বা লক্ষণা একটুও দেখা যায় না। শব্দ ছাড়া অন্যত্রও ব্যঞ্জকত্ব দেখা যায় বলিয়া ইহার বাচকত্ব প্রভৃতি শব্দমূলক বৈশিষ্ট্য আছে এইরূপ বলা সঙ্গত হইবে না। শব্দের যে সকল প্রকার আছে তন্মধ্যে বাচকত্ব, লক্ষণা প্রভৃতি প্রসিদ্ধ প্রকার হইতে ব্যঞ্জকত্ব বিভিন্ন; তৎসত্ত্বেও যদি ব্যঞ্জকত্বকে এই সকল শব্দ-প্রকারের অন্তর্ভুক্ত কল্পনা করা হয় তাহা হইলে তাহাকে শব্দের বৈশিষ্ট্য বলিয়াই কেন পরিকল্পনা করা হয় না? তাহা হইলে দেখা যাইতেছে—শব্দের ব্যবহারে তিনটি প্রভেদ আছে, বাচকত্ব, গৌণীবৃত্তি এবং ব্যঞ্জকত্ব। তন্মধ্যে ব্যঞ্জকত্ব-ঘটিত ব্যবহারে যখন ব্যঞ্জকত্ব প্রাধান্য লাভ করে তাহার নাম হয় ধ্বনি, তাহার অবিবক্ষিতবাচ্য এবং বিবক্ষিতান্যপরবাচ্য এই দুই প্রকারের প্রভেদ আছে গ্রন্থের প্রথম অংশেই সবিস্তারে তাহার নির্ণয় করা হইয়াছে।

অপর কেহ বলিতে পারেন—আচ্ছা, বিবক্ষিতান্যপরবাচ্য ধ্বনিতে গৌণীবৃত্তি নাই, এই মত যুক্তিসঙ্গতই। যেহেতু যেখানে অন্য অর্থের প্রতীতির পূর্ব্বে বাচ্য ও বাচকসম্পর্কিত জ্ঞান থাকে সেইখানে কেমন করিয়া গৌণীবৃত্তির প্রয়োগ হইবে? কিন্তু যেখানে কোন নিমিত্তকে উপলক্ষ্য করিয়া গৌণীবৃত্তিতে শব্দ তাহার নিজের অর্থকে একেবারে আচ্ছন্ন করিয়া অন্য বিষয়ে আরোপিত হয়, যেমন "বালকটি অগ্নি" অথবা যেখানে শব্দ আংশিকভাবে নিজের অর্থকে পরিত্যাগ না করিয়া তাহার সম্বন্ধের দ্বারা অন্য বিষয় অধিকার করে, যেমন "গঙ্গায় ঘোষবসতি", সেইখানেই গৌণীবৃত্তি নাই এমন কথা বলা যায় না। প্রত্যুত, সেইরূপ ক্ষেত্রে অবিবক্ষিতবাচ্যত্ব উৎপন্ন হয়। এই জন্যই বিবক্ষিতান্যপরবাচ্যধ্বনিতে দেখা যায় যে বাচ্য ও বাচক উভয়েরই নিজ

নিজ স্বরূপের প্রতীতি হয় এবং অন্য অর্থও বোঝান হয়; তাই সেইখানে ব্যঞ্জকত্বের ব্যবহার যুক্তিসঙ্গত। ব্যঞ্জক তাহাকেই বলে যাহা নিজের রূপকে প্রকাশিত করিয়াই পরের প্রকাশক হয়। সেইরূপ বিষয়ে বাচকত্বেরই ব্যঞ্জকত্ব হয় বলিয়া তথায় গৌণীবৃত্তির ব্যবহার কখনই করা যাইতে পারে না। কিন্তু অবিবক্ষিতবাচ্যধ্বনি কেমন করিয়া গৌণীবৃত্তি হইতে পৃথক্ হইবে? যেহেতু তাহার যে দুই প্রকার ভেদ আছে তাহাতে গৌণীবৃত্তির দুইটি প্রভেদের রূপ অবশ্যই দেখা যায়। উত্তরে বলা যায়—ইহাও দোষের নহে, যেহেতু অবিবক্ষিতবাচ্যধ্বনি গৌণীবৃত্তির মার্গ আশ্রয় করিলেও তাহার ও উহার রূপ একেবারে এক নহে, কারণ যেখানে ব্যঞ্জকত্ব মোটেই নাই সেইখানে গৌণীবৃত্তি আছে এইরূপ প্রয়োগও দেখা যায়। যে ব্যঙ্গ্য অর্থকে চারুত্বের হেতু বলিয়া বলা হইয়াছে তাহাকে বাদ দিয়া ব্যঞ্জকত্ব অবস্থান করে না। কিন্তু গৌণীবৃত্তি অভিন্নরূপে দুইভাবে উপচারিত হইতে পারে—হয় বাচ্যধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়া অথবা শুধু ব্যঞ্জনার প্রয়োজনকে অবলম্বন করিয়া। একটি বস্তু অপর কোন বস্তুর সঙ্গে অভিন্ন বলিয়া কল্পিত হইতে পারে, যেমন তীক্ষ্ণতারূপ প্রয়োজন বুঝাইবার জন্য বলিতে পারা যায় "বালকটি অগ্নি" অথবা আহ্লাদকত্ব বুঝাইবার জন্য বলা যাইতে পারে, ইহার মুখই চন্দ্র, অথবা যেমন "প্রিয়ে জনে নাস্তি পুনরুক্তম্" ইত্যাদিতে। আবার লক্ষণারূপ যে গৌণীবৃত্তি আছে তাহাও লক্ষণীয় সম্বন্ধকে আশ্রয় করিয়া থাকিতে পারে। সেইখানে চারুত্বশালী ব্যঙ্গ্য অর্থের প্রতীতি ছাড়াই লক্ষণা অবশ্যই সম্ভব হয়, যেমন—মঞ্চগুলি চীৎকার করিতেছে ইত্যাদিতে। যেখানে লক্ষণা চারুত্বশালী ব্যঙ্গ্য অর্থের প্রতীতির হেতু হয় বাচকত্বের ন্যায় সেইখানেও ব্যঞ্জকত্বের অনুপ্রবেশের দ্বারাই তাহা সম্ভব হয়। যেখানে অসম্ভাব্য অর্থ বুঝাইতে গৌণীবৃত্তির প্রয়োগ হয় যেমন "সুবর্ণপুষ্পাং পৃথিবীম্"

ইত্যাদিতে, সেইখানেও চারুত্বশালী ব্যঙ্গ্যের প্রতীতিই প্রযোজক। তথাবিধ বিষয়েও গৌণীবৃত্তি থাকা সত্ত্বেও ধ্বনির ব্যবহারই যুক্তিসঙ্গত। সুতরাং অবিবক্ষিতবাচ্যধ্বনির দুই প্রভেদেই যে গৌণীবৃত্তি আছে সেইখানে ব্যঞ্জকত্বের বৈশিষ্ট্য নাই। ইহারা অভিন্নরূপ নহে, কারণ সহৃদয় হৃদয়ের আহ্লাদকারী প্রতীয়মানের প্রতীতি ব্যঞ্জকত্বের হেতু, অথচ অন্য বিষয়ে এমন গৌণীবৃত্তির প্রয়োগও দেখা যায় যাহা চারুত্বপ্রতীতির হেতু নহে। এই সকল কথা পূর্ব্বে সূচিত হইলেও স্ফুটতর প্রতীতির জন্য পুনরায় কথিত হইল। অপিচ, শব্দ ও অর্থের ব্যঞ্জকত্বলক্ষণযুক্ত যে ধর্ম্ম তাহা যে প্রসিদ্ধ বাচক সম্বন্ধকে আশ্রয় করিয়া অবস্থিত আছে—ইহা কাহারও সন্দেহের কারণ হইতে পারে না। শব্দ ও অর্থের বাচ্যবাচকভাবাখ্য যে প্রসিদ্ধ সম্বন্ধ আছে তাহাকে উপজীব্য করিয়াই অন্য কারণকলার সঙ্গে সম্বন্ধ স্বীকার করিয়া ব্যঞ্জকত্বলক্ষণযুক্ত ব্যাপার প্রবর্ত্তিত হয়। এই সম্বন্ধ ঔপাধিক অর্থাৎ কোন নির্দ্দিষ্ট সঙ্কেতের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত না হইয়াও ইহা ব্যঞ্জকত্বরূপ বৈচিত্র্যযুক্ত হয়। এই জন্যই বাচকত্ব হইতে ইহার পার্থক্য। বাচকত্ব হইতেছে শব্দের বৈশিষ্ট্যের নৈসর্গিক, অবিচল, নিয়ত আত্মা; বাচ্য-বাচকরূপ সম্বন্ধের প্রথম ব্যুৎপত্তি হইতে আরম্ভ করিয়া তাহা শব্দের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত হইয়া থাকে, এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে। কিন্তু ব্যঞ্জনাব্যাপার শব্দের ব্যতিক্রমহীন নিয়ত বৈশিষ্ট্য নহে যেহেতু ইহা ঔপাধিক, অ-নৈসর্গিক এবং বৈচিত্র্যময়। প্রকরণাদির সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত হইলেই তাহার প্রতীতি হয়, নচেৎ তাহার প্রতীতি হয় না। প্রশ্ন হইতে পারে, যাহা অব্যভিচারী, অবিচল নহে তাহার স্বরূপের পরীক্ষা করিয়া লাভ কি? উত্তরে বলা যাইতে পারে, ইহাতে দোষ নাই, যেহেতু শব্দের আত্মার সঙ্গে ইহার সম্বন্ধ বিচার করিলে ইহাকে অনিয়ত বলিয়া মনে হইবে, কিন্তু ইহার নিজের ব্যঞ্জকত্বলক্ষণযুক্ত

বিষয়ে ইহা সেইরূপ নহে। এই ব্যঞ্জকত্ববিষয়ে অনুমান-প্রমাণ-বিষয়ক হেতুর ( লিঙ্গের ) ব্যবহারের অনুরূপ ব্যবহার দেখা যায়। যে আশ্রয় বা আধারে হেতু থাকে তাহার সঙ্গে হেতুর যে সম্পর্ক তাহা নিয়ত ও নিশ্চিত নহে, কারণ ইচ্ছানুসারে তাহা আমাদের জ্ঞানের বিষয় হইতে পারে বা পারে না; কিন্তু নিজের বিষয়ে অর্থাৎ আশ্রয়ে বা পক্ষে তাহার অস্তিত্ব, সমজাতীয় বস্তুতে অস্তিত্ব এবং বিপক্ষজাতীয় বস্তুতে তাহার অনস্তিত্বের বোধ হইলে ইহার ব্যতিক্রম দেখা যায় না। ব্যঞ্জকত্বের স্বরূপ যেভাবে দেখান হইল তাহাও এইরূপ। শব্দের আত্মার সঙ্গে ইহার যে সম্পর্ক তাহা অবিচল নহে বলিয়া তাহা বাচকত্বের প্রকারবিশেষ এইরূপ কল্পনা করা যায় না। যদি তাহা বাচকত্বের প্রকারবিশেষই হয় তাহা হইলে বাচ্য যেমন শব্দের আত্মার সহিত অবিচলভাবে সর্ব্বদা সংযুক্ত থাকে ব্যঞ্জকত্বেরও সেইরূপ হইবে। যে বাক্যবিদ্ মীমাংসক শব্দসমূহে শব্দ ও অর্থের নিত্য সম্বন্ধ কল্পনা করেন, যিনি লৌকিক এবং অপৌরুষেয় বেদ বাক্যের মধ্যে পার্থক্য দেখিতে পান তাঁহাকেও তথাবিধ ব্যঞ্জকত্বলক্ষণযুক্ত অনৈসর্গিক ঔপাধিক ধর্ম্মকে অবশ্যই মানিতে হইবে। যদি মীমাংসক ব্যঞ্জনা অস্বীকার করেন তাহা হইলে শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ নিত্য হইলেও অপৌরুষেয় বেদবাক্য ও লৌকিক বাক্যের অর্থ প্রতিপাদনের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকে না। আর যদি ব্যঞ্জনাকে স্বীকার করিয়া লওয়া যায় তাহা হইলে লৌকিক বাক্য সম্পর্কে এই বলা যায় যে সেইখানে শব্দসমূহ বাচ্যবাচকভাব পরিত্যাগ না করিলেও তাহাদের মধ্যে পুরুষের ইচ্ছার বিধান অনুসারে অন্য অনিত্য ঔপাধিক ব্যাপার সমারোপিত হয় বলিয়া তাহাদের অর্থ মিথ্যাও হইতে পারে। ইহা দেখা যায় যে যদিও বস্তুসমূহ নিজেদের স্বভাব পরিবর্তন করে নাই তথাপি অন্য কারণকলাপের প্রভাবে অন্য ঔপাধিক ব্যাপার সম্পন্ন হয় বলিয়া তাহারা স্বভাববিরুদ্ধ কাজ করিয়া

থাকে। তাই চন্দ্র প্রভৃতি সকল জীবলোকের তাপশান্তিদায়ক শীতলতা বহন করে; কিন্তু যাহাদের মন প্রিয়ার বিরহাগ্নিতে দগ্ধ হইতেছে তাহারা ইহাদিগকে দেখিলে যে সন্তাপ আনয়ন করে তাহা প্রসিদ্ধই। সুতরাং শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ নিত্য হইলেও যে মীমাংসক লৌকিক বাক্যের অর্থের মিথ্যাত্ব প্রমাণ করিতে চাহেন তিনিও বলিবেন যে তাহাতে এমন কিছু প্রকাশ পায় যাহা বাচ্যবাচকের অতিরিক্ত এবং যাহা ঔপাধিক অর্থাৎ যাহা নৈসর্গিক নহে। তাহা ব্যঞ্জকত্বব্যতিরেকে আর কিছু নহে। ব্যঙ্গ্য অর্থের প্রকাশনই ব্যঞ্জকত্ব। লৌকিক বাক্যসমূহ প্রধানতঃ লোকের অভিপ্রায়ই প্রকাশ করে। পুরুষের এই অভিপ্রায় ব্যঙ্গ্যই, বাচ্য নহে, কারণ তাহার সহিত শব্দের বাচ্যবাচক ভাবলক্ষণযুক্ত সম্বন্ধ নাই। আপত্তি হইতে পারে যে এই যুক্তিতে সকল লৌকিকবাক্যেই ধ্বনি সংযুক্ত হইয়া পড়িবে, কারণ এইভাবে তর্ক করিলে সকল বাক্যেরই ব্যঞ্জকত্ব থাকে। এই যুক্তি সত্য; বক্তার অভিপ্রায় প্রকাশ করার জন্য যে ব্যঞ্জকত্ব থাকে তাহা সকল লৌকিক বাক্যেই তুল্যভাবে অবশ্যই থাকে। তাহা কিন্তু বাচকত্ব হইতে ভিন্ন নহে; যেহেতু ব্যঙ্গ্য সেইখানে প্রধান বলিয়া বিবক্ষিত হয় না, বাচ্য অর্থের মধ্যে লীন থাকে। যেখানে ব্যঙ্গ্য অর্থ প্রধান ভাবে বিবক্ষিত হয় সেইখানে ব্যঞ্জকত্ব ধ্বনিব্যবহারের প্রযোজক হইয়া থাকে। কিন্তু যেখানে অভিপ্রায়বৈশিষ্ট্যরূপ ব্যঙ্গ্য অর্থ শব্দ ও অর্থের দ্বারাই প্রকাশিত হয় সেইখানে তাহা বাচ্যের পরে ব্যঞ্জনার দ্বারা প্রকাশিত হইয়া প্রাধান্য লাভ করে। আবার ধ্বনির ব্যবহারের ক্ষেত্র অপরিমিত বলিয়া তাহাই ধ্বনির প্রয়োজক হয় না, কারণ তাহার ব্যাপকত্ব নাই। তাই ব্যঙ্গ্যের যে তিন প্রকারভেদ দেখান হইয়াছে তাহা অভিপ্রায়রূপই হউক আর অনভিপ্রায়রূপই হউক বাচ্য অর্থের পরে ব্যঞ্জনার দ্বারা প্রকাশিত হইলে তাহা সবই ধ্বনির প্রযোজক হইতে পারে। এইরূপ ব্যঞ্জকত্ব-বৈশিষ্ট্যময় ধ্বনিলক্ষণ করিলে অতিব্যাপ্তি বা অব্যাপ্তি কোন দোষই হয় না।

সুতরাং ব্যঞ্জকত্বলক্ষণযুক্ত শব্দের এই সমগ্র ব্যাপার মীমাংসকদের মতের বিরোধী নহে, বরং ইহা তাঁহাদের মতের অনুকূলই হয় এইরূপ দেখা যায়। যে পণ্ডিতগণ নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত, অভ্রান্ত শব্দব্রহ্মের অস্তিত্ব স্বীকার করেন তাঁহাদের মত আশ্রয় করিয়া এই ধ্বনিব্যবহারে প্রবৃত্ত হইয়াছি; তাঁহাদের সঙ্গে বিরোধ বা অবিরোধের কথা কেন চিন্তা করা হইবে? যে যুক্তিবাদীরা শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধকে কৃত্রিম বলিয়া মনে করেন তাঁহাদের কাছে শব্দের এক অর্থ প্রকাশ করিয়া আর এক অর্থ প্রকাশ করিবার শক্তির মত এই ব্যঞ্জকভাব অনুভবসিদ্ধ এবং তাঁহাদের মতের সঙ্গে ইহার কোন বিরোধ নাই; সুতরাং তাঁহাদের মত আমাদের খণ্ডনীয় নহে।

শব্দের বাচকত্ববিষয়ে তার্কিকদের সংশয় প্রবর্তিত হয় তো হউক—এই শক্তি কি নৈসর্গিক না ইহা কৃত্রিম ইত্যাদিতে সংশয় থাকিতে পারে। (প্রদীপাদি একটি বস্তু বুঝাইয়া আর একটি বুঝায়—ইহা যেমন লৌকিক জগতে প্রসিদ্ধ আছে তেমনি) ব্যঞ্জকত্ব বাচকত্বের পরে উৎপন্ন হইয়া উপলব্ধির বিষয় হয় ইহাতে সংশয়ের অবকাশ কোথায়? যে বিষয় অলৌকিক তৎসম্পর্কে তার্কিকদের প্রচুর সংশয় প্রবর্তিত হয়, কিন্তু লৌকিক জগতের প্রত্যক্ষ বস্তু সম্পর্কে নহে। লোকের ইন্দ্রিয়গোচর যে নীল, মধুরাদি তত্ত্ব তাহাতে বিরোধিতার কোন অবকাশ নাই; তার্কিকেরা সেইখানে সংশয়াচ্ছন্ন হইয়াছেন এমন দেখা যায় না। যাহা অবিসংবাদিতরূপে নীল তাহাকে নীল বলিলে অপর ব্যক্তি বিরোধিতা করিয়া বলেন না যে ইহা নীল নহে, ইহা পীত। সেইরূপ বাচকশব্দ, অবাচক সঙ্গীতধ্বনিদের শব্দ এবং শব্দহীন প্রচেষ্টা—ইহাদের সকলেরই ব্যঞ্জকত্ব অনুভবসিদ্ধ; কে তাহার অপলাপ করিতে পারে? বিদগ্ধ-গোষ্ঠীতে দেখা যায় যে নানারূপ ব্যাপার সুন্দর অর্থ সূচনা করিতেছে, অথচ সেই অর্থের সঙ্গে শব্দের অভিধার কোন সম্পর্ক নাই। আবার কোন কোন রমণীয় অর্থদ্যোতক ব্যাপার মুক্তকাদিতে প্রসিদ্ধরূপে নিবদ্ধ হইয়াছে

অথবা গন্ধের মত অবিন্যস্তরূপ গ্রহণ করিয়াছে। এই যে বিচিত্ররূপে প্রকাশিত ব্যাপারসমূহ—নিজেকে উপহাসাস্পদ না করিয়া কোন্ সচেতা ব্যক্তি তাহার অস্তিত্ব সম্পর্কে অতি সন্দেহপরায়ণ হইবেন? কেহ বলেন—সন্দেহ করিয়া দেখার অবসর অবশ্যই আছে। ব্যঞ্জকত্ব শব্দসমূহের অর্থবোধক শক্তি; তাহা অনুমিতির সাধনরূপ লিঙ্গস্বরূপ। ব্যঙ্গ্যের প্রতীতি লিঙ্গী বা সাধ্যের প্রতীতিই। সুতরাং শব্দসমূহের ব্যঙ্গ-ব্যঞ্জক সম্বন্ধ লিঙ্গ এবং লিঙ্গীর সম্বন্ধই, আর কিছু নহে। তুমি এখনই প্রতিপাদন করিয়াছ যে ব্যঞ্জকত্ব বক্তার অভিপ্রায়ের অপেক্ষা রাখে এবং বক্তার অভিপ্রায় অনুমেয়স্বরূপই। ইহা হইতে এই সিদ্ধান্ত অবশ্য গ্রহণ করিতে হইবে যে ব্যঞ্জক ও ব্যঙ্গ্যের সম্বন্ধ লিঙ্গ ও লিঙ্গীর সম্পর্কের ন্যায়।

ইহার উত্তরে বলা হইতেছে—যদি এইরূপই হয় তাহা হইলেও আমাদের মতের কোন অংশ খণ্ডিত হইল? বাচকত্ব ও গৌণীবৃত্তির শব্দের আর একটি ব্যাপার আছে যাহা ব্যঞ্জকত্বলক্ষণযুক্ত—আমরা এই মত মানিয়া লইয়াছি। এইরূপ লিঙ্গ-লিঙ্গী ভাব বিচার করিলেও তাহার কোন ক্ষতি হয় না। সেই যে ব্যঞ্জকত্ব তাহা লিঙ্গত্বই হউক্ বা অন্য কিছু হয় তো হউক্। শব্দের যে বাচকশক্তি, ব্যঞ্জকত্ব তাহা হইতে বিভিন্ন অথচ ইহা শব্দেরই ব্যাপার—এই দুইটি জিনিস মানিয়া লইলে আমাদের মধ্যে আর বিরোধই থাকে না। যাহা ব্যঞ্জকত্ব তাহাই লিঙ্গত্ব এবং যাহা ব্যঙ্গ্য অর্থের প্রতীতি তাহাই লিঙ্গীর প্রতীতি—এইরূপ মত কিন্তু খাঁটি কথা নহে, যেহেতু নিজের মত প্রমাণ করিবার জন্য তুমিও আমাদের কথার অনুসরণ করিয়া বক্তার অভিপ্রায়কেই ব্যঙ্গ্য বলিয়া মানিয়া লইয়াছ এবং সেই অভিপ্রায় প্রকাশন বিষয়ে শব্দের ব্যাপারকে লিঙ্গত্ব বলিয়া প্রতিপাদন করিয়াছ।

সেইজন্য আমাদের পূর্ব্বে প্রচারিত মত এখন বিভাগ করিয়া

বলিতেছি। শ্রবণ কর—শব্দের বিষয় দ্বিবিধ—প্রতিপাদ্য ও অনুমেয়। তন্মধ্যে অনুমানের লক্ষণই হইল বিবক্ষা। সেই বিবক্ষা দুই প্রকারের হইতে পারে—শব্দস্বরূপের প্রকাশ করিবার ইচ্ছা আর শব্দের দ্বারা অর্থ প্রকাশ করিবার ইচ্ছা। তন্মধ্যে প্রথমটি শব্দের ব্যবহারেব অঙ্গ নহে। তাহা শুধু ইহাই বুঝায় যে বক্তা সজীব প্রাণী। দ্বিতীয় যে ইচ্ছা তন্মধ্যে শব্দ স্বরূপের অবধারণ ব্যবধানের সৃষ্টি করে; তাহার অবসান হইলে শব্দের অর্থের বোধ হয় এবং শব্দেব করণরূপে ব্যবহারই এই শব্দসম্পর্কিত বোধের কারণ। এই দুই ইচ্ছাই শব্দসমূহের অনুমেয় বিষয়। কিন্তু প্রয়োগকর্ত্তার অর্থ প্রতিপাদন করিবার ইচ্ছার বিষয়ভূত যে অর্থ তাহা শব্দের প্রতিপাদ্য ব্যাপার; তাহাও দ্বিবিধ—বাচ্য ও ব্যঙ্গ্য। প্রয়োগকর্ত্তা কখনও কখনও স্ববোধক শব্দের (স্ব-শব্দের) দ্বারা অর্থপ্রকাশ করিতে ইচ্ছা করে আবার কখনও এমন কোন প্রয়োজনের অনুসারে অর্থপ্রকাশ করিতে চাহে যাহা স্ববোধক শব্দের দ্বারা অভিহিত করা যায় না। শব্দসমূহের সেই দ্বিবিধ প্রতিপাদ্য বিষয়ের কোনটিই শব্দকে লিঙ্গরূপে ব্যবহার করিয়া নিজের প্রকৃত রূপে প্রকাশিত হয় না; বরং কৃত্রিম-অকৃত্রিম বা অন্য কোন সম্বন্ধকে আশ্রয় করিয়াই প্রকাশিত হইয়া থাকে। শব্দের প্রতিপাদ্য যে অর্থ তাহার বিবক্ষা অনুমেয়রূপে প্রতীত হয়, অর্থের প্রতিপাদ্য বাচ্যত্ব ও ব্যঞ্জনা সেইভাবে প্রতীত হয় না। যদি এই অর্থ লিঙ্গ-ভাবেই প্রযুক্ত হয় তাহা হইলে ধূমাদি লিঙ্গের দ্বারা অগ্নি প্রভৃতি অন্য অনুমেয় বিষয়ে যেমন সত্যমিথ্যা লইয়া বিবাদ হইতে পারে না এইখানেও সেইরূপ বিবাদের কোন অবকাশই থাকে না। ব্যঙ্গ্য অর্থ বাচ্য অর্থের সামর্থ্যের দ্বারা আক্ষিপ্ত হয় বলিয়া বাচ্য অর্থের মত ইহাও শব্দের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্তই। যদি আপত্তি হয় যে ইহা সাক্ষাৎভাবে শব্দের সঙ্গে সংযুক্ত হয় না, তাহা হইলে বলা যাইতে পারে যে সাক্ষাৎ-অসাক্ষাৎভাব এখানে অপ্রাসঙ্গিক, কারণ তাহার দ্বারা সম্বন্ধের যোজনা হইতেছে না।

যে বাচ্যবাচক ভাবকে আশ্রয় করে তাহা পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে। সুতরাং ব্যঙ্গ্যবিষয়ে বক্তার অভিপ্রায় যে বোঝান হয় তাহাই এখানে শব্দসমূহের লিঙ্গভাবমূলক ব্যাপার। কিন্তু তাহার বিষয়ীভূত যে অর্থ তাহা প্রতিপাদ্য হইয়া প্রকাশিত হয়। সেই যে অর্থ যাহার মধ্যে আংশিকভাবে অভিপ্রায় আছে এবং আংশিকভাবে অভিপ্রায় নাই, তাহা যে প্রতীয়মান হয় তাহা বাচকত্বের দ্বারাই প্রতীয়মান হয় অথবা অন্যসম্বন্ধের দ্বারা হয়। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে বাচকত্বের দ্বারা ইহা সম্পাদিত হইতে পারে না। যদি অন্যসম্বন্ধ স্বীকার করা যায় তবে দেখা যায় যে তাহার মধ্যে ব্যঞ্জকত্বই আছে। ব্যঞ্জকত্ব লিঙ্গত্বস্বরূপ নহে, কারণ আলোকাদিতে অন্যপ্রকার দেখা যায়। সুতরাং শব্দসমূহের যে প্রতিপাদ্য বিষয় তাহা ঠিক বাচ্যের মতই লিঙ্গ-লিঙ্গী ভাবে সম্বন্ধযুক্ত হয় না। তাহার যে ব্যাপার লিঙ্গ-লিঙ্গী ভাবে সম্বন্ধযুক্ত হয় বলিয়া দেখান হইয়াছে তাহা বাচ্যরূপে প্রতীত হয় না; বরং তাহা বক্তার ইচ্ছারূপে বাচ্য অর্থের উপাধিরূপে প্রতীত হয়। লৌকিক ব্যবহারে বক্তার অভিপ্রায় লইয়া কোন কলহ নাই; বক্তাপ্রযুক্ত শব্দের অর্থ লইয়াই যত মতদ্বৈধ। এই অর্থ যদি শব্দের দ্বারা লিঙ্গীরূপে অনুমেয় হইত তাহা হইলেও কোন সংশয় থাকিত না। এই সকল কথা বলাই হইয়াছে। যেমন বাচ্য অর্থের বিষয়ে অন্য প্রমাণের দ্বারা কোথাও সম্যক্‌-প্রতীতি সম্পাদিত হইলে তাহা সেই অন্য প্রমাণের বিষয় হইলেও তাহার শব্দব্যাপারমূলক বিষয়ত্বের হানি হয় না; ব্যঙ্গ্যেরও সেইরূপ। কাব্য-বিষয়েও সত্যাসত্য নিরূপণ ব্যঙ্গ্যপ্রতীতির প্রযোজক হয় না। সেইখানে ব্যঙ্গ্যব্যতিরিক্ত অন্য কোন প্রমাণের পরীক্ষা করিতে গেলে উপহাসাস্পদ হইতে হইবে। অতএব ইহা বলা যায় না যে লিঙ্গের প্রতীতিই সর্ব্বত্র ব্যঙ্গ্যের প্রতীতি। অভিপ্রায়লক্ষণযুক্ত যে অনুমেয়রূপ ব্যঙ্গ্য তন্মধ্যে শব্দসমূহের যে ব্যঞ্জকত্ব আছে তাহা ধ্বনি-ব্যবহারের কারণ হয় না।

শব্দসমূহের যে ব্যঞ্জকত্বলক্ষণযুক্ত ব্যাপার তাহা যে মীমাংসক শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধকে নিত্য বলিয়া মনে করেন তিনিও স্বীকার করিবেন; ইহা প্রদর্শন করিবার জন্য এই যুক্তিসমূহ বিন্যস্ত হইল। সেই ব্যঞ্জকত্ব যে কোথাও লিঙ্গত্বরূপে, কোথাও অন্যরূপে বাচক এবং অবাচক শব্দে থাকে তাহা সকল মতাবলম্বীর পক্ষেই অনস্বীকার্য্য। ইহা দেখাইবার জন্য আমরা যত্ন আরম্ভ করিয়াছি। সুতরাং এইভাবে বিচার করিলে দেখা যাইবে যে শব্দের গৌণীবৃত্তি, বাচকত্ব প্রভৃতি প্রকার হইতে ইহা অবশ্যই বিভিন্ন। সেই ব্যঞ্জকত্ব গৌণীবৃত্তি ও বাচকত্বের অন্তর্ভুক্ত হইলেও যদি জোর করিয়া তাহাকে অভিধান পর্য্যায়ে আনা যায় তাহা হইলেও ব্যঞ্জকত্ববিশেষাত্মক ধ্বনির যে প্রকাশন ব্যাপার তাহা সহৃদয়ের ব্যুৎপত্তির জন্য অথবা সন্দেহের নিরসনের জন্য সম্পাদিত হইলে অতিশয় আদরণীয় হইবে। সাধারণ লক্ষণ মাত্র করা হইলে তদ্দ্বারা বিশেষ বিশেষ লক্ষণের উপযোগিতার খণ্ডন করা হয় না। যদি তাহাই হইত তাহা হইলে শুধু অস্তিত্বের লক্ষণ করিলেই তদন্তর্গত সকল অস্তিত্বশালী বস্তুর লক্ষণ করা হইয়া যায় এবং তাহাদের কথা বলিতে গেলে পুনরুক্তির সম্ভাবনা থাকে। সুতরাং এইভাবে বলা যাইতে পারে—

"কাব্যের ধ্বনি নামক তত্ত্ব জানা ছিল না; তাই তাহা মনীষীদের সংশয়ের বিষয় ছিল; সেই ধ্বনি প্রকাশিত হইল।"

**গুণীভূতব্যঙ্গ্য নামে কাব্যের আর এক প্রকার দেখা যায়; সেইখানে ব্যঙ্গ্য অর্থের সঙ্গে অন্বিত হইয়া বাচ্য সৌন্দর্য্য প্রকর্ষ লাভ করে। ৩৪॥**

রমণীর লাবণ্যসদৃশ যে ব্যঙ্গ্য অর্থ প্রতিপাদন করা হয় তাহার প্রাধান্য হইলে তাহা ধ্বনিপদবাচ্য হয়। তাহা গৌণ হইলে যেখানে বাচ্য অর্থের দ্বারা প্রকট হয় তাহাকে কাব্যের গুণীভূতব্যঙ্গ্য নামক প্রভেদ বলিয়া কল্পনা করা হয়। সেইখানে যে বাচ্য অর্থ আচ্ছন্ন হইয়াছে তাহা হইতে যদি

শুধু বস্তু প্রতীয়মান হয় এবং সেই ব্যঙ্গ্যবস্তু পুনরায় কোথাও বাচ্যরূপ বাক্যার্থের তুলনায় অপ্রধান হয় তাহা হইলে গুণীভূতব্যঙ্গ্য কাব্যের নিদর্শন পাওয়া যায়। যেমন—

"এখানে এই কি অপূর্ব্ব লাবণ্যের সিন্ধু যেখানে চন্দ্রের সহিত উৎপলেরা সন্তরণ করিতেছে, যেখানে হস্তীর কুম্ভতট উঁচু হইয়া আছে, যেখানে অনন্যসাধারণ কদলীকাণ্ড ও মৃণালদণ্ডও আছে।"

যে সকল শব্দসমূহের বাচ্য অর্থ আচ্ছন্ন হইয়া যায় নাই সেইরূপ শব্দ হইতেও যদি ব্যঙ্গ্য অর্থ প্রতীয়মান হয় এবং সেইখানে যদি বাচ্য অর্থের প্রাধান্যের দ্বারা কাব্যের চারুত্বলাভ হয় এবং ব্যঙ্গ্য অর্থ তদপেক্ষা গৌণ হইয়া পড়ে তাহা হইলেও গুণীভূতব্যঙ্গ্যতা হয়। যেমন—উদাহৃত—"অনুরাগবতী সন্ধ্যা" ইত্যাদিতে। এই প্রকার ভেদেই যেখানে নিজের উক্তির দ্বারাই ব্যঙ্গ্য অর্থ প্রকাশিত হইয়া তাহার অপ্রাধান্য হয়, তাহার উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে, যেমন—"সঙ্কেতকালমনসমং' ইত্যাদি। রসাদিরূপ ব্যঙ্গ্য অর্থের যে অপ্রধান অবস্থা তাহা রসবদ্ অলঙ্কারে দর্শিত হইয়াছে। সেই রসবদ্ অলঙ্কারাদিতে বাক্যের যে মূল প্রতিপাদ্য অংশ তাহার তুলনায় যে ব্যঙ্গ্য অর্থ অপ্রধান হয় তাহা যেন বিবাহে প্রবৃত্ত ভৃত্যের পশ্চাতে রাজার অনুগমন। ব্যঙ্গ্য অলঙ্কার অপ্রধান হইলে তাহা দীপকাদির বিষয় হয়। সুতরাং—

**এই যে প্রসন্ন, গম্ভীর পদবিশিষ্ট কাব্যনিবন্ধসমূহ। যাহারা সুখ আনয়ন করে তন্মধ্যেই মেধাবী ব্যক্তি এই প্রভেদটি যোজনা করিবেন। ৩৫॥**

এই যে কাব্যনিবন্ধসমূহ ইহাদের স্বরূপ পরিমাপ করা না গেলেও প্রকাশমান হইলে ইহারা তথাবিধ অর্থের জন্য রমণীয় হইয়া সুবিবেচক ব্যক্তিদের সুখ আনয়ন করে। এই সকল কাব্যবন্ধের মধ্যেই গুণীভূত ব্যঙ্গ্যপ্রকারও যোগ করিতে হইবে। যেমন—

"কন্যা লক্ষ্মী, জামাতা হরি, গৃহিণী গঙ্গা, পুত্রদ্বয় চন্দ্র ও অমৃত—অহো সমুদ্রের কি কুটুম্ব-সৌভাগ্য !"

**ব্যঙ্গ্য অংশ বাচ্যের অনুসরণ করিলেই এই বাচ্য-অলঙ্কারবর্গ প্রায়ই অতিশয় শোভা ধারণ করে—ইহা লক্ষ্য দৃষ্টান্তে দেখা যায়। ৩৬॥**

ব্যঙ্গ্য অলঙ্কার অথবা ব্যঙ্গ্য বস্তুমাত্র যথাযোগ্য ভাবে বাচ্যের অনুসরণ করিলে এই বাচ্য-অলঙ্কারবর্গ অতিশয় শোভা লাভ করে। ইহা লক্ষণকারকেরা একদেশবিবর্ত্তী রূপক সম্পর্কে দেখাইয়াছেন। লক্ষ্য দৃষ্টান্তে সকল অলঙ্কার পরীক্ষা করিলে দেখা যাইবে সর্ব্বত্রই প্রায় এইরূপ দেখা যায়। এইভাবে বিচার করিলে দেখা যাইবে যে দীপক ও সমাসোক্তির ন্যায় অন্য অলঙ্কারসমূহও অন্য ব্যঙ্গ্য অলঙ্কার অথবা অন্য ব্যঙ্গ্যবস্তুর সংস্পর্শ লাভ করে। যেহেতু প্রথমেই বলা যাইতে পারে সকল অলঙ্কারের অভ্যন্তরেই অতিশয়োক্তির সন্নিবেশ করা যাইতে পারে এবং মহাকবিরা তাহার সন্নিবেশ করিলে তাহা কি অপূর্ব্ব শোভার পোষকতা করে। আতিশয্যের সংযোগ নিজের বিষয়ের ঔচিত্যের অনুসারে করা হইলে কেনই বা না তাহা উৎকর্ষ বহন করিয়া আনিবে? ভামহও অতিশয়োক্তির লক্ষণ নির্দ্দেশ প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—

"এই সবই বক্রোক্তি; ইহার দ্বারা অর্থ বিচিত্ররূপে প্রকাশিত হয়। ইহার বিষয়ে কবি যত্ন করিবেন; ইহা ব্যতিরেকে আর কি অলঙ্কার আছে?"

সেই অলঙ্কার বিষয়ে দেখা যায় যে অতিশয়োক্তি যে অলঙ্কারের মধ্যে থাকে কবির প্রতিভাবলে তাহা অতিশয় চারুত্বযুক্ত হয়; অন্য অলঙ্কার শুধু অলঙ্কারই থাকে। সুতরাং ইহার সকল অলঙ্কারের শরীর গ্রহণ করার যোগ্যতা থাকায় উপচারবলে মনে হয় যে ইহাই সর্ব্বালঙ্কাররূপী। এই অর্থই বুঝিতে হইবে। তাহার যে অন্য অলঙ্কারের সঙ্গে সম্মিশ্রণ

বা সঙ্কর হয় তাহা কদাচিৎ বাচ্যার্থের দ্বারা আবার কদাচিৎ ব্যঙ্গ্যার্থের দ্বারা সম্পাদিত হয়। ব্যঙ্গ্যার্থ কদাচিৎ প্রাধান্য লাভ করে আবার কদাচিৎ অপ্রধান থাকে। প্রথম প্রকারে পাই বাচ্য অলঙ্কার, দ্বিতীয় প্রকারে তাহা ধ্বনির অন্তর্ভুক্ত হয় এবং তৃতীয় প্রকারে গুণীভূতব্যঙ্গতা। এইরূপ প্রকারভেদ অন্যান্য অলঙ্কারেও পাওয়া যায় কিন্তু তাহারা সমস্ত অলঙ্কারের সাধারণ রূপ গ্রহণ করে না। কিন্তু সকল অলঙ্কারই অতিশয়োক্তির বিষয় হইতে পারে অর্থাৎ অন্য অলঙ্কার অনুপ্রবিষ্ট হইলেও অতিশয়োক্তি সম্ভব হয়। ইহাই তাহার বৈশিষ্ট্য। রূপক, উপমা, তুল্যযোগিতা নিদর্শনা প্রভৃতি যে সকল অলঙ্কারে সাদৃশ্যের দ্বারা নিহিত তত্ত্বের উপলব্ধি করিতে হয় সেইখানে ব্যঙ্গ্য সাদৃশ্যধর্ম্মই শোভাতিশয্যশালী হয়। তাহারা চারুত্বাতিশয়যুক্ত হইয়া সবাই গুণীভূতব্যঙ্গ্যের বিষয় হয়। সমাসোক্তি, আক্ষেপ, পর্য্যায়োক্ত প্রভৃতিতে নিহিত তত্ত্ব ব্যঙ্গ্য অংশের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত থাকে; তাই ইহা যে গুণীভূত ব্যঙ্গ্য হয় তাহা লইয়া বিবাদের অবকাশই নাই। সেই গুণীভূতব্যঙ্গ্য অবস্থায় দেখা যায় যে কোন কোন অলঙ্কার অন্য অলঙ্কারের অভ্যন্তরে থাকে—ইহাই নিয়ম। যেমন ব্যাজস্তুতি অলঙ্কারের অভ্যন্তরে কোন বিশেষ অলঙ্কার থাকে না, যে কোন অলঙ্কারের স্পর্শ থাকে। যেমন সন্দেহাদি অলঙ্কারের অভ্যন্তরে থাকে সাদৃশ্য বা উপমা। আবার কোন কোন অলঙ্কার পরস্পর পরস্পরের অভ্যন্তরে থাকে। যেমন—দীপক ও উপমা। দীপকের অভ্যন্তরে যে উপমা থাকে তাহা সুপ্রসিদ্ধই। উপমাও কোথাও কোথাও দীপকের শোভার উপকরণ হয়। যেমন—মালোপমা। এই ভাবে বিচার করিলে দেখা যাইবে যে "প্রভামহত্যা শিখয়েব দীপঃ" (মহতী প্রভাবিশিষ্ট শিখার দ্বারা দীপ যেমন) ইত্যাদিতে (কুমারসম্ভব ১।২৮) দীপকের শোভা স্পষ্ট হইয়াই প্রকাশিত হয়।

এইভাবে ব্যঙ্গ্যের সংস্পর্শ হইলে রূপকাদি অলঙ্কারবর্গ অতিশয় চারুত্বযুক্ত হয় এবং ইহারা সবাই গুণীভূতব্যঙ্গ্যের মার্গ। যে সকল অলঙ্কারের কথা বলা হইল অথবা বলা হয় নাই তজ্জাতীয় সকল অলঙ্কারের মধ্যেই গুণীভূতব্যঙ্গ্য সাধারণভাবে থাকে। তাহার লক্ষণ করা হইলে ইহারা সবাই ভালভাবে লক্ষিত হইয়া পড়ে। সকল শব্দের সাধারণ লক্ষণ বাদ দিয়া প্রতি পদ পাঠ করিয়া তাহাদের তত্ত্ব নিশ্চিত করিয়া জানা যায় না, কারণ শব্দের অন্ত নাই। এইখানেও সেইরূপ। শব্দ সংখ্যাতীত এবং অলঙ্কার তাহারই প্রকার। অলঙ্কার ছাড়া ব্যঙ্গ্যের বস্তু ও রসমূলক আর যে দুইপ্রকার আছে তাহাদের বিচার করিলেও দেখা যায় যে তাহাদের মধ্যেও যেখানে ব্যঙ্গ্য অর্থ বাচ্য অর্থের উপকরণ হয় সেইখানে গুণীভূতব্যঙ্গ্যের বিষয় অবশ্যই আছে। সুতরাং এই যে দ্বিতীয় প্রকার আছে যাহাতে ধ্বনি নিঃষ্যন্দিত হয় তাহাও অতি রমণীয় বলিয়া মহাকবিদের কাব্যের বিষয়ীভূত হয়; সহৃদয় ব্যক্তিরা ইহার লক্ষণ নিরূপণ করিবেন। এমন কোন কাব্য নাই যাহা সহৃদয় ব্যক্তির হৃদয়গ্রাহী অথচ যেখানে প্রতীয়মান অর্থের সংস্পর্শের দ্বারা সৌন্দর্য লাভ হয় নাই। সুতরাং ইহাই কাব্যের রহস্য। পণ্ডিতেরা ইহা মনে রাখিবেন।

**রমণীরা অলঙ্কার ধারণ করিলেও যেমন লজ্জাই তাহাদের প্রধান ভূষণ হয় মহাকবিদের বাক্যের প্রতীয়মান অর্থের শোভাও সেইরূপ। ৩৭ ॥**

অর্থ সুপ্রসিদ্ধ হইলেও ইহার জন্য কি অপূর্ব্ব কমনীয়তা লাভ করে।

"সম্ভোগকালে কামদেবের আজ্ঞানুসারে মুগ্ধনয়না রমণীর মধ্যে যে অপূর্ব্ব চিরনবীন লীলাবিলাস সমূহ দেখা দেয় তাহা কেবল চিত্তের মধ্যে ভাবনার বিষয়।"

এইখানে "কেঽপি" (কি অপূর্ব্ব) এই পদের দ্বারা বাচ্য অর্থকে

স্পষ্টরূপে বুঝাইয়া অনন্তপ্রসারিত, সুস্পষ্ট প্রতীয়মান অর্থের বিন্যাস করিয়া কি শোভাই না সম্পাদন করা হইয়াছে।

**কাকু বা স্বরব্যতিক্রমের দ্বারা এই যে অর্থান্তরের বোধ জন্মান হয় তাহাতে ব্যঙ্গ্যের অপ্রাধান্য হয় এবং তাহা এই গুণীভূতব্যঙ্গ্য-প্রকারকে আশ্রয় করে। ৩৮॥**

কাকুর দ্বারা এই যে অর্থান্তরের প্রতীতি কোথাও দৃষ্ট হয় তাহাতে ব্যঙ্গ্য অর্থের অপ্রাধান্য হয় বলিয়া তাহা এই কাব্যপ্রভেদকে আশ্রয় করে। যেমন "স্বস্থা ভবন্তি ময়ি জীবতি ধার্ত্তরাষ্ট্রাঃ" (আমি জীবিত থাকিতে ধৃতরাষ্ট্রপুত্রেরা সুস্থ থাকিবে) ইত্যাদিতে। অথবা যেমন—

"আমরা তো অসতীই; হে পতিব্রতে, তোমাকে আর বলিতে হইবে না; তোমার কুল তো কলঙ্কিত হয় নাই। আমরা কিন্তু অপরের স্ত্রী হইয়া সেই নাপিতের প্রতি অনুরক্ত হই নাই।"

শব্দের শক্তিই নিজের অভিধেয় অর্থের সামর্থ্যের দ্বারা আক্ষিপ্ত স্বর-বিকারের (কাকুর) সহায়তা লাভ করিলে অর্থ বিশেষের বোধ জন্মাইতে পারে, যে কোন কাকু নহে। কারণ অন্য বিষয়ে নিজের ইচ্ছানুসারে যে কোনভাবে স্বরবিকার করিলে তাহার দ্বারা সেই প্রকারের অর্থের বোধ সম্ভব নহে। যেখানে প্রতীয়মান অর্থ থাকে সেইখানে বিশেষ স্বরবিকার শব্দব্যাপারের সহকারী হইলেও এবং প্রতীয়মান অর্থ শব্দব্যাপারের আশ্রয় লইলেও তাহা অর্থের সামর্থ্যের দ্বারা প্রাপণীয়। তাই ইহাও ব্যঙ্গ্যেরই প্রকারবিশেষ। যেখানে ব্যঞ্জকত্ব বাচকত্বের অনুগমন করে এবং সেইজন্যই ব্যঙ্গ্যবিশিষ্ট বাচ্যের প্রতীতি হয় সেইখানে সেই জাতীয় অর্থবোধক কাব্যকে গুণীভূতব্যঙ্গ্য বলিয়া নামকরণ করিতে হইবে। যাহা ব্যঙ্গ্যবিশিষ্ট বাচ্য অর্থ অভিহিত করে তাহা গুণীভূতব্যঙ্গ্যত্ব লাভ করে।

**যেখানে যুক্তির প্রয়োগের দ্বারা গুণীভূতব্যঙ্গ্যের বিষয় নির্দ্ধারিত হয় সহৃদয় ব্যক্তিরা তাহাতে ধ্বনি যোজনা করিবেন না। ৩৯ ॥**

দৃষ্টান্ত বিচার করিলে দেখা যায় যে ধ্বনি ও গুণীভূতব্যঙ্গ্যের কোন কোন মার্গ মিশিয়া যায়। সেইরূপ হইলে যেখানে যে মার্গ অধিক যুক্তিসঙ্গত তদ্দ্বারাই সেইখানে নামকরণ করিতে হইবে। সর্ব্বত্রই যে ধ্বনির প্রতি অনুরাগ দেখাইতে হইবে তাহা নহে। যেমন—

"পতির শিরস্থিত চন্দ্রকলা ইহার দ্বারা স্পর্শ করিও"—সখী তাহার চরণ অলক্তকে রঞ্জিত করিয়া পরিহাসপূর্ব্বক এইরূপ আশীর্ব্বাদ করিলেন। তিনি কথা না বলিয়া মাল্যের দ্বারা তাহাকে আঘাত করিলেন।'

অথবা যেমন—

"স্বামী উচ্চস্থিত পুষ্পগুলি দিতে যাইয়া সপত্নীর নাম উচ্চারণ করিয়া ফেলিলে মানিনী নায়িকা কিছু বলিল না; বাষ্পাকুললোচনে পা দিয়া মাটিতে লিখিতে লাগিল।"

এইখানে "নির্বচনং জঘান" (কিছু না বলিয়া আঘাত করিলেন)—এবং "ন কিঞ্চিদূচে" (কিছুই বলিল না)—এই বাক্যাংশদ্বয়ে কথা বলার নিষেধ বুঝাইতেছে বলিয়া ব্যঙ্গ্য কথঞ্চিৎ বাচ্য অর্থের বিষয়ীকৃত হইয়া গৌণভাবেই শোভা পাইতেছে। যেখানে ভঙ্গীবিশিষ্ট বক্র উক্তি ছাড়া ব্যঙ্গ্য অর্থ প্রকাশিত হয় সেইখানে তাহার প্রাধান্য হয়। যেমন—"এবংবাদিনি দেবর্ষৌ" ইত্যাদিতে। এখানে কিন্তু উক্তির বক্রতা বা বিশেষ ভঙ্গীর দ্বারা অর্থ প্রকাশিত হওয়ায় বাচ্যেরই প্রাধান্য। সুতরাং এইখানে অনুরণনরূপ ব্যঙ্গ্যধ্বনি নামকরণ করিলে তাহা যুক্তিযুক্ত হইবে না।

**কাব্যের এই প্রকারকে গুণীভূতব্যঙ্গ্য বলা হইলেও যে কাব্য আলোচনা করিলে দেখা যায় যে তাহাতে রসাদি মুখ্যরূপে আছে তাহা ধ্বনিরূপ পাইয়া থাকে। ৪০ ॥**

যে কাব্যপ্রকার গুণীভূতব্যঙ্গ্যশ্রেণীভুক্ত তাহার মধ্যেও পর্য্যালোচনার দ্বারা যদি রস-ভাব প্রভৃতির মুখ্যতা পাওয়া যায় তাহা হইলে তাহা ধ্বনিত্বই লাভ করে। যেমন, এইখানেই যে শ্লোক দুইটির উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে তাহাদের মধ্যে।, অথবা যেমন—

"হে সুন্দর, রাধা সহজে আরাধ্য নহে। যেহেতু প্রত্যক্ষ দেখিতেছি তুমি প্রাণেশ্বরীর নীবী-বসনের দ্বারা অশ্রুমোচন করিতেছ।

স্ত্রীচরিত্র কঠিন, সুতরাং আর প্রসাদোপচার করিয়া লাভ কি? অতএব তুমি বিরত হও। বহু অনুনয়পরায়ণ হইলে যে হরিকে এরূপ বলা হইল তিনি তোমাদের কল্যাণ করুন।"

এইভাবে ধ্বনি ও গুণীভূতব্যঙ্গ্যের প্রভেদ স্থির করা হইলে বোঝা যায় যে "ন্যক্কার হ্যয়মেব" ইত্যাদিতে নির্দ্দিষ্টপদে ব্যঙ্গ্যবিশিষ্ট বাচ্য অর্থের প্রতিপাদন করা হইয়া থাকিলেও বাক্যের প্রধান অর্থ হইল রসের অভিব্যক্তি এবং তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই এই শ্লোকের ব্যঞ্জকত্ব কথিত হইয়াছে। সেই সকল পদে অর্থান্তরসংক্রমিতবাচ্য ধ্বনি আছে এইরূপ ভ্রম করিলে চলিবে না, কারণ সেই সকল পদের বাচ্য অর্থই বিবক্ষিত হইয়াছে। সেই সকল পদে বাচ্য অর্থের উপকরণ রূপে ব্যঙ্গ্য অর্থ থাকে এইরূপ প্রতীতি হয়, বাচ্য অর্থ ব্যঙ্গ্য অর্থে পরিণত হয় এইরূপ দেখা যায় না। সুতরাং সেইখানে সমগ্র বাক্যই ধ্বনির অন্তর্গত। পদগুলিতে রহিয়াছে গুণীভূতব্যঙ্গ্যতা। কেবল যে গুণীভূতব্যঙ্গ্যের পদগুলিই অলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ্য ধ্বনির ব্যঞ্জক হয় তাহা নহে; অর্থান্তরসংক্রমিত-বাচ্য ধ্বনি প্রভেদগুলিও অলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ্যের ব্যঞ্জক হয়। যেমন এই শ্লোকেই 'রাবণ' এই পদ ধ্বনির অন্য প্রভেদের ব্যঞ্জক হইয়াছে। কিন্তু যে বাক্যে রসাদিতাৎপর্য্য নাই, সেই বাক্য গুণীভূতব্যঙ্গ্যের অন্তর্গত পদসমূহের দ্বারা উদ্ভাসিত হইলেও গুণীভূতব্যঙ্গ্যতাই সেইখানে সমুদায় বাক্যের ধর্ম্ম। যেমন—

"মানুষেরা রাজাকেও সেবা করে, বিষও ভক্ষণ করে, স্ত্রীদের সহিতও রমণ করে—ইহারা বস্তুতঃই কর্ম্মকুশল।"

ইত্যাদিতে। যত্নের সহিত বাচ্য অর্থ ও ব্যঙ্গ্য অর্থের প্রাধান্য ও অপ্রাধান্য বিচার করিতে হইবে, যাহাতে ধ্বনি, গুণীভূতব্যঙ্গ্য ও অলঙ্কারের বিশুদ্ধ অবিমিশ্র বিষয় ভালভাবে জানা যাইতে পারে। তাহা না হইলে প্রসিদ্ধ অলঙ্কার বিষয়েই ভ্রম হইবে। যেমন—

"এই তন্বীর দেহ নির্ম্মাণ করিবার সময় বিধাতার মনে কি ইচ্ছা ছিল তাহা আমরা জানি না। তিনি লাবণ্যধনের ব্যয় গণনা করেন নাই। মহান্ ক্লেশ স্বীকার করিয়াছেন; যে লোকসমাজ সুখে, নিশ্চিন্তে, স্বাচ্ছন্দ্যে বাস করিতেছিল তাহার চিন্তাগ্নি উদ্দীপিত করিয়াছেন আর এই হতভাগিনীও উপযুক্ত প্রণয়ীর অভাবে নিপীড়িতা হইতেছে।"

এই শ্লোকটিকে কেহ কেহ যে ব্যাজস্তুতি বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহা ঠিক নহে। যেহেতু এই পদ্যের বাচ্য অর্থ যদি ব্যাজস্তুতি অলঙ্কার-মাত্রে পর্য্যবসিত হয় তাহা হইলে তাহাতে অর্থের সুসঙ্গতি হয় না, কারণ কোন অনুরাগী ব্যক্তি এইভাবে বিতর্ক করিতে পারে না। "এবাপি স্বয়মপি তুল্যরমণাভাবাদ্বরাকী হতা"—এবংবিধ উক্তি তাহার পক্ষে অসম্ভব। বীতরাগ ব্যক্তির পক্ষেও এই যুক্তি শোভন নহে। কারণ যে অনুরাগকে জয় করিয়াছে এবংবিধ বিতর্ককে পরিহার করাই তাহার একমাত্র কাজ। এই শ্লোক কোন বিশেষ কাব্যপ্রবন্ধে প্রয়োগ করা হইয়াছে এমন শোনা যায় নাই; তাহা হইলে সেই প্রকরণ অনুসারে ইহার অর্থ পরিকল্পিত হইতে পারে। সুতরাং ইহা অপ্রস্তুতপ্রশংসা। যেহেতু এই শ্লোকের বাচ্য অর্থ গৌণ হইয়া উপচাররূপে গৃহীত হইয়া কোন বিশেষ মনোবৃত্তিসম্পন্ন লোকের পরিতাপ প্রকাশ করিতেছে। বক্তা নিজেকে অসামান্য গুণশালী বলিয়া মনে করে এবং সেই অভিমানে স্ফীত; নিজের মহিমার আধিক্যের জন্য এই ব্যক্তি অপরের প্রতি

মাৎসর্য্যাক্রান্ত এবং অন্য কোন বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি আছে বলিয়া সে মনে করে না। ইহা ধর্ম্মকীর্ত্তির শ্লোক বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। ইহা সম্ভবও বটে যে এই শ্লোক তাঁহারই। যেহেতু তাঁহারই—

"অল্প ধীশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি আমার মতবাদের মধ্যে গাহন করিতে পারে নাই। যাহারা অধিক আয়াস করিয়াছে তাহারাও ইহার পরমার্থতত্ত্ব দেখিতে পায় নাই। আমার মতে জগতে কোন উপযুক্ত প্রতিগ্রাহক লাভ না করিয়া সমুদ্রের জলের মত স্বদেহের মধ্যেই জরা প্রাপ্ত হইবে।"

এই শ্লোকের দ্বারাও এবংবিধ অভিপ্রায়ই প্রকাশিত হইয়াছে। অপ্রস্তুতপ্রশংসা অলঙ্কারেও যাহা বাচ্য তাহা কোথাও বিবক্ষিত হয়, আবার কোথাও অবিবক্ষিত হয়, আবার কোথাও তাহা বিবক্ষিত ও অবিবক্ষিতও হয়—এই তিন রকমেই ইহার রচনা হইতে পারে। তন্মধ্যে বিবক্ষিতত্বের উদাহরণ যেমন—

"পরার্থে যে পীড়া অনুভব করে, ভাঙ্গিলেও যে মধুর থাকে, যাহার বিকার সংসারের সকলের কাছে প্রিয়ই হয়, সেই ইক্ষু যদি একেবারে অক্ষেত্রে পতিত হইয়া বৃদ্ধি না পায় তাহা কি ইক্ষুর দোষ না উষর মরুভূমির অপরাধ?"

অথবা যেমন মদীয় শ্লোকে—

"এই যে সুন্দরাকৃতিবিশিষ্ট অবয়বসমূহ দৃষ্টিপথে আসে ক্ষণকালের জন্যও যে চক্ষুর বিষয়ীভূত হইলে ইহারা সফলতা লাভ করে সেই চক্ষু এখন আলোকহীন লোকজগতে অন্য সকল নগণ্য অবয়বের তুল্য হইয়াছে অথবা তাহাদের তুল্য হয় নাই।"

এই দুই শ্লোকে ইক্ষু ও চক্ষুর স্বরূপ বিবক্ষিত হইয়াছে, কিন্তু ইহারা প্রস্তাবিত বিষয় নহে; যেহেতু কোন মহাগুণসম্পন্ন ব্যক্তি অনুপযুক্ত স্থানে পতিত হইলে তিনি যে ব্যর্থতা লাভ করেন তাহা বর্ণনা করিবার

**উদ্দেশ্যই** দুইটি শ্লোকের ব্যঞ্জিত তাৎপর্য্য এবং তাহাই প্রস্তাবিত বিষয়। **অবিবক্ষিতত্বের** উদাহরণ, যেমন—

" 'ওহে তুমি কে?' 'বলিতেছি, আমাকে দৈবাহত শাখোটক বৃক্ষ বলিয়া জানিবে।' 'তুমি যেন বৈরাগ্য হইতেই এইরূপ বলিতেছ?' 'তুমি তো তাহা ভাল করিয়াই জান।' 'কেন এইরূপ কথা বলিতেছ?' 'এখানে বামদিকে বটবৃক্ষ; তাহাকে পথিকেরা সর্ব্বতোভাবে স্বীকার করে। কিন্তু আমি পথে অবস্থিত থাকিলেও আমার পরোপকারক ছায়ামাত্র নাই।' "

কোন বৃক্ষবিশেষের সঙ্গে উক্তি-প্রত্যুক্তি সম্ভব নহে। সুতরাং এই শ্লোকের বাচ্য অর্থ বিবক্ষিত হয় নাই। সমৃদ্ধিশালী অসৎপুরুষের সমীপবর্ত্তী কোন দরিদ্র মনস্বী ব্যক্তির পরিতাপ এই বাক্যের তাৎপর্য্য। তাহাই বাচ্য অর্থের দ্বারা প্রকাশিত হইয়া প্রতীত হইতেছে। বিবক্ষিতত্ব ও অবিবক্ষিতত্ব যেমন—

"হে পামর, তুমি এই উৎপথবর্ত্তী শোভাহীন ফুলফলপত্ররহিত বদরীবৃক্ষকে জীবিকা দান করিয়া উপহাসের পাত্র হইবে।"

এখানে বাচ্য অর্থ সুসঙ্গত নহে আবার একেবারে অসম্ভবও নহে। সুতরাং বাচ্য অর্থ ও ব্যঙ্গ্য অর্থের প্রাধান্য ও অপ্রাধান্য যত্নসহকারে নিরূপণীয়।

**"কথিত নিয়মানুসারে ব্যঙ্গ্য অর্থ কাব্যে প্রধান ও অপ্রধান উভয় প্রকারে অবস্থিত থাকে। তাহা ব্যতিরিক্ত যাহা কিছু তাহা চিত্র বলিয়া অভিহিত হয়।" ৪১ ॥**

**"শব্দ ও অর্থের প্রভেদানুসারে চিত্র দ্বিবিধ হইয়া থাকে। তাহার মধ্যে কতক অংশ শব্দচিত্র; বাকী অংশ বাচ্য অর্থ-সম্পর্কিত।" ৪২ ॥**

ব্যঙ্গ্য অর্থ প্রাধান্য লাভ করিলে ধ্বনিনামক কাব্যপ্রকারের পরিচয়

পাওয়া যায়; তাহার অপ্রাধান্য হইলে সেই কাব্যকে বলা যায় গুণীভূত-ব্যঙ্গ্য। এতদ্ব্যতিরিক্ত যাহা রসভাবাদি তাৎপর্য্যরহিত ও ব্যঙ্গ্যার্থপ্রকাশের শক্তিশূন্য তাহা কেবল বাচ্য ও বাচকের বৈচিত্র্যকে আশ্রয় করিয়া রচিত হয়; তাহা প্রাণহীন আলেখ্যের মত হইয়া প্রকাশিত হয় এবং তাহার নাম চিত্র। তাহা প্রধানতঃ কাব্য নহে; তাহা কাব্যের অনুকরণ। তন্মধ্যে কোনটি শব্দচিত্র, যেমন দুর্ঘট যমকাদি। বাচ্যচিত্র শব্দচিত্র হইতে বিভিন্ন; ইহাতে ব্যঙ্গ্যার্থের সংস্পর্শরহিত, রসাদিতাৎপর্য্যশূন্য উৎপ্রেক্ষাদি বাক্যের অর্থরূপে অবস্থিত থাকে। প্রশ্ন হইতে পারে—আচ্ছা, এই চিত্রনামধেয় বস্তুটি কি?—যেখানে প্রতীয়মান অর্থের সংস্পর্শ নাই। পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে যে প্রতীয়মান অর্থ তিন প্রকারের। তন্মধ্যে যেখানে বস্তু বা অলঙ্কার ব্যঙ্গ্য হয় না তাহা চিত্রের বিষয় বলিয়া কল্পিত হউক। যেখানে রসাদির বিষয় থাকে না, সেইরূপ কাব্যপ্রকার সম্ভবই হয় না; কারণ কাব্য কোন বস্তুর সংস্পর্শে আসিবে না এইরূপ হইতেই পারে না। আবার জগৎগত সকল বস্তুই কোন রস বা ভাবের অঙ্গ হিসাবে থাকে, অন্ততঃ ইহাদের বিভাব হিসাবে। রসাদিও চিত্তবৃত্তিবিশেষ; এমন বস্তু জগতে নাই যাহা কোন চিত্তবৃত্তি উৎপন্ন করে না। তাহা উৎপন্ন না হইলে উহা কবির বিষয়ই হইবে না; তাই কবির কোন বিশেষ বিষয়ই চিত্র বলিয়া নিরূপিত হয়। পূর্ব্বপক্ষীয়ের এই আপত্তির উত্তরে বলা হইতেছে—ইহা সত্য; এমন কোন কাব্যপ্রকার নাই যাহাতে রসাদির প্রতীতি হয় না। কিন্তু যখন রসাভাবাদি প্রকাশ করিবার ইচ্ছা না করিয়া কবি শব্দালঙ্কার বা অর্থালঙ্কার রচনা করেন তখন রচয়িতার সেই বিবক্ষা অনুসারে অর্থের রসাদিশূন্যতার পরিকল্পনা করা হয়। কাব্যে শব্দসমূহের অর্থ কবির বিবক্ষাকে আশ্রয় করিয়াই অবস্থিত থাকে। কবির বিবক্ষা না থাকিলেও শুধু বাচ্য অর্থের সামর্থ্যের দ্বারাই রসাদির প্রতীতি উৎপন্ন হইলে তাহা অতিশয় দুর্ব্বল হয়। এই ভাবেই নীরসত্বের

পরিকল্পনা করিয়া রসহীন চিত্রের বিষয় ব্যবস্থাপিত হয়। তাই ইহা বলা হইয়াছে—

"রসভাবাদিবিষয়ক বিবক্ষা না থাকিলে যে অলঙ্কার রচনা করা হয় তাহা চিত্রের বিষয় বলিয়া স্থির করা হইয়াছে। রসাদির বর্ণনা দেওয়ার বিবক্ষাই যেখানে কাব্যের তাৎপর্য্যের বিষয় হয় সেইখানে এমন কাব্যই হইতে পারে না যাহা ধ্বনির অন্তর্গত হয়।"

বিশৃঙ্খলবাক্ কবিরা রসাদির তাৎপর্য্যের প্রতি দৃষ্টি না দিয়াই কাব্যরচনায় প্রবৃত্ত হয়েন দেখিয়া আমরা এই চিত্রের পরিকল্পনা করিয়াছি। আধুনিক লেখকগণ উপযুক্তরূপে কাব্যনীতির ব্যবস্থা করিয়াছেন বলিয়া এখন আর এমন কাব্যপ্রকারই নাই যাহা ধ্বনির বহির্ভূত; যেহেতু পরিপক্ক কবিরা রসাদিতাৎপর্য্য পরিত্যাগ করিয়া অন্য ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইলে তাহা শোভন হয় না। রসাদিতাৎপর্য্যে এমন কোন বিষয়ই নাই, যাহা অভীষ্ট রসাঙ্গতা লাভ করিলে প্রশস্ত গুণসম্পন্ন না হয়। এমন অচেতন বস্তু নাইই যাহারা যথাযথভাবে সমুচিত রসের বিভাব হইলে অথবা যাহাদের বর্ণনায় চেতনবস্তুর বৃত্তান্ত যোজনা করা হইলে তাহা রসের অঙ্গ হয় না। তাই ইহা বলা হইতেছে—

"অপার কাব্যসংসারে কবিই একমাত্র প্রজাপতি ব্রহ্মা। যেমন ইহার অভিরুচি সেইভাবেই এই বিশ্ব পরিবর্ত্তিত হয়। যদি কবি শৃঙ্গাররসপ্রবণ হয়েন তাহা হইলে সমগ্র জগৎ রসময় হয়। আবার তিনিই যদি বীতরাগ হয়েন তাহা হইলে সকল জগৎ রসহীন হইয়া পড়ে। সুকবি নিজের স্বাধীন প্রেরণা অনুসারে চেতনাহীন বস্তুসমূহকে চেতনপ্রাণীর মত ব্যবহারে প্রবর্ত্তিত করান এবং চেতনবস্তুকে অচেতনবস্তুর মত ব্যবহারে নিয়োজিত করান।"

সুতরাং এমন বস্তু নাই যাহা সর্ব্বতোভাবে রসতাৎপর্য্যবান্ কবির রসসৃষ্টিমূলক ইচ্ছানুসারে তাঁহার অভিপ্রেত রসের অঙ্গতা লাভ না করে

এবং সেইভাবে সন্নিবেশিত হইলে চারুত্বাতিশয্যের পোষকতা না করে। এই সকল জিনিষই মহাকবিদের কাব্যে দেখা যায়। আমরাও স্বীয় কাব্যপ্রবন্ধে ইহা যথাযথতভাবে দেখাইয়াছি। এইভাবে অবস্থিত থাকিলে কোন কাব্যপ্রকারই ধ্বনির ধর্ম্মত্ব হইতে বিচ্যুত হয় না। রসানুযায়ী হইলে কবির রচিত গুণীভূতব্যঙ্গ্যলক্ষণযুক্ত কাব্যও রসাঙ্গতা লাভ করে—ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। আবার চাটু বাক্যসমূহে অথবা দেবতাস্তুতিসমূহে রসাদি যে অঙ্গ হিসাবে থাকে অথবা ত্রিবর্গলাভোপায়ের জ্ঞাতব্য বিষয়ে নৈপুণ্যশালী ব্যক্তির হৃদয়গ্রাহী কোন কোন গাথাতে যে ব্যঙ্গ্যসমন্বিত বাচ্য অর্থের প্রাধান্য থাকে ও সেই গুণীভূতব্যঙ্গ্যকাব্যে বাচ্যপ্রাধান্য লাভ করে বলিয়া ধ্বনি নিশ্চল হইয়া থাকে—ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। সুতরাং কাব্যবিষয়ক নীতির উপদেশ দেওয়া হইয়া গেলে যদি বা প্রাথমিক অভ্যাসার্থী চিত্রের ব্যবহার করে তবুও পরিণতবুদ্ধি কবিদের পক্ষে ধ্বনিই কাব্য। তাই এই সংগ্রহশ্লোক দেওয়া হইল—

"যেখানে রস বা ভাব তাৎপর্য্যের সহিত প্রকাশিত হয়, যেখানে বস্তু বা অলঙ্কারকে গোপন করিয়াই অভিহিত করা হয়, কাব্যমার্গে তাহার নাম ধ্বনি; ব্যঙ্গ্যের প্রাধান্য তাহার একমাত্র নিমিত্ত এবং সহৃদয় ব্যক্তিরা তাহাকেই কাব্যের বিষয় বলিয়া জানিবেন।"

**সেই ধ্বনির আবার গুণীভূত অলঙ্কার এবং নিজের প্রভেদসমূহের সঙ্গে সঙ্কর বা সংসৃষ্টি হয় বলিয়া তাহা বহুভাবে প্রকাশিত হয়। ৪৩ ॥**

সেই ধ্বনির নিজের প্রভেদসমূহের সঙ্গে এবং গুণীভূতব্যঙ্গ্য ও বাচ্যালঙ্কারসমূহের সঙ্গে সঙ্কর ও সংসৃষ্টির ব্যবস্থা করিলে দৃষ্টান্তে ইহার বহু প্রভেদ লক্ষ্য করা যাইবে। এইভাবে বিচার করিলে দেখা যাইবে যে নিজের প্রভেদের সঙ্গে সঙ্করযুক্ত, নিজের প্রভেদের সঙ্গে সংসৃষ্টিযুক্ত; গুণীভূতব্যঙ্গ্যের সঙ্গে সঙ্করযুক্ত, গুণীভূতব্যঙ্গ্যের সঙ্গে সংসৃষ্টিযুক্ত,

ব্যঙ্গ্যাতিরিক্ত বাচ্যালঙ্কারের সঙ্গে সঙ্করযুক্ত, ব্যঙ্গ্যাতিরিক্ত বাচ্য অলঙ্কারের সঙ্গে সংসৃষ্টিযুক্ত, সংসৃষ্টিমূলক অলঙ্কারের সঙ্গে সংসৃষ্টিযুক্ত— ইত্যাদি বহুরকমে ধ্বনি প্রকাশিত হয়। তন্মধ্যে নিজের প্রভেদের সঙ্গে সঙ্কর কখনও কখনও অনুগ্রাহ্য-অনুগ্রাহক ভাবকে আশ্রয় করিয়া থাকে এইরূপ দেখা যায়, যেমন "এবংবাদিনি দেবর্ষৌ' ইত্যাদিতে। এখানে অর্থশক্তিমূলক অনুরণনরূপ ব্যঙ্গ্যধ্বনি প্রভেদের দ্বারা অলক্ষ্যক্রম-ব্যঙ্গ্যধ্বনি অনুগৃহীত হইতেছে। কোথাও প্রভেদদ্বয়ের সম্পাতসম্পর্কে সন্দেহমূলক সঙ্করও এইভাবে প্রতীত হয়। যেমন—

"হে দেবর, এই রমণী উৎসবে আমন্ত্রিত হইয়া এখানে আসিয়াছিল, তোমার স্ত্রী ইহাকে কি জানি বলিয়াছে। এই হতভাগিনী শূন্য বলভীগৃহে রোদন করিতেছে—ইহাকে অনুনয় কর।"

এখানে 'অনুনীয়তাম্' (অনুনয় কর)—এই পদ অর্থান্তরসংক্রমিতবাচ্য এবং বিবক্ষিতান্যপরবাচ্য দুই ভাবেই আসিতে পারে।

ইহার কোন একটি পক্ষ গ্রহণ করিবার স্বপক্ষে নিশ্চিত প্রমাণ নাই। একই ব্যঞ্জকে অলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ্যধ্বনির ও তাহার স্বীয় অন্য প্রভেদ প্রবেশ করিতেছে এইরূপ বহু দৃষ্টান্ত দেখান সম্ভব। যেমন—"স্নিগ্ধশ্যামল" ইত্যাদিতে। নিজের প্রভেদের সঙ্গে সংসৃষ্টির উদাহরণ যেমন পূর্ব্ব উদাহরণেই। এই যে শ্লোক ইহাতে অর্থান্তরসংক্রমিতবাচ্যধ্বনি ও অত্যন্ত-তিরস্কৃতবাচ্যধ্বনির সংসৃষ্টি হইয়াছে। গুণীভূতব্যঙ্গ্যের সঙ্গে সঙ্করের উদাহরণ, যেমন—"ন্যক্কারো হ্যয়মেব যদরয়ঃ" ইত্যাদিতে। অথবা যেমন—

"যে দ্যূতক্রীড়াচাতুরীসমূহের কর্ত্তা, যে জতুময় গৃহে অগ্নিসংযোগ করাইয়াছে, যে কৃষ্ণার কেশ এবং উত্তরীয় অপনয়নে পটু, পাণ্ডবেরা যাহার দাস, দুঃশাসনাদির যে রাজা, একশত অনুজের যে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, অঙ্গরাজের যে মিত্র—সেই অভিমানী দুর্যোধন কোথায় আছে বল। আমরা ক্রোধভরে তাহাকে দেখিতে আসি নাই।"

এই যে উদাহরণ ইহাতে অলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ্যধ্বনি সমগ্র বাক্যের অর্থ; পদগুলি ব্যঙ্গ্যসমন্বিত বাচ্য অর্থ অভিহিত করিতেছে; তজ্জন্য ইহাদের সম্মিশ্রণ হইয়াছে। সুতরাং আরও বলা যাইতে পারে যে যদি পদের অর্থকে আশ্রয় করিয়া গুণীভূতব্যঙ্গ্য থাকে এবং বাক্যের অর্থকে আশ্রয় করিয়া ধ্বনি থাকে, এইভাবে সঙ্কর হইলেও তাহাতে কোন বিরোধ হয় না। যেমন নিজ প্রভেদসমূহের মধ্যে সঙ্করের ফলে বিরোধ হয় না, এইখানেও তেমনি। আবার ধ্বনির অন্যান্য প্রভেদসমূহ পদের অর্থ এবং বাক্যের অর্থকে আশ্রয় করিয়া পরস্পরের সঙ্গে সঙ্করমূলক সম্বন্ধের দ্বারা যুক্ত হইলে কোন বিরোধিতা হয় না। অধিকন্তু, এই ব্যঙ্গ্যকে আশ্রয় করিয়া প্রধান ও অপ্রধান ভাব হইলে তাহারা পরস্পরবিরোধী হয়; বিভিন্ন ব্যঙ্গ্যকে আশ্রয় করিলে সেই বিরোধিতা হয় না। এই কারণেও ইহাদের মধ্যে কোন বিরোধিতা হয় না। বাচ্যবাচক ভাব থাকিলে যেমন একই জায়গায় বহু পদার্থের এই সঙ্কর ও সংসৃষ্টিমূলক ব্যবহারে কোন বিরোধিতা হয় না, ব্যঙ্গ্যব্যঞ্জকভাবের প্রয়োগেও সেইরূপই—ইহা মনে রাখিতে হইবে। আবার যেখানে কোন কোন পদ অবিবক্ষিতবাচ্যধ্বনির অন্তর্গত, কোন কোন পদের বাচ্য অর্থই প্রধান এবং অনুরণনরূপ ব্যঙ্গ্য তাহার সহকারী, সেই সকল ক্ষেত্রে ধ্বনি ও গুণীভূতব্যঙ্গ্যের সংসৃষ্টি হয়। যেমন—"তেষাং গোপবধূ-বিলাস সুহৃদাম্" ইত্যাদিতে। এখানে 'বিলাসসুহৃদাং', 'রাধারহঃ সাক্ষিণাম্'—এই দুইটি পদ ধ্বনির প্রভেদস্বরূপ-বিশিষ্ট, 'তে', 'জানে' এই দুইটি পদ গুণীভূতব্যঙ্গ্যের লক্ষণযুক্ত। রসবদ্‌অলঙ্কারযুক্ত কাব্যে অলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ্যের সঙ্গে বাচ্যালঙ্কারের সঙ্কর নিশ্চয়ই হইতে পারে। বস্তুধ্বনি প্রভৃতি অন্য প্রভেদসমূহেরও সঙ্কর হইযাই থাকে। যেমন মদীয় নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকে—

"হে সমুদ্রশয্যাশায়ি, কবিদিগের যে নবীন দৃষ্টি রসসমূহকে রসান্বিত করিতে ব্যাপৃত থাকে, পণ্ডিতদের যে দৃষ্টি নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত বিষয়ের

উন্মেষণে নিয়োজিত—আমরা এই দুইটিকেই অবলম্বন করিয়া বিশ্বকে নিঃশেষে বর্ণনা করিতে করিতে শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছি। কিন্তু তোমার প্রতি ভক্তির তুল্য সুখ আমরা একেবারেই পাই নাই।"

এইখানে বিরোধ-অলঙ্কারের সঙ্গে অর্থান্তরসংক্রমিতবাচ্য নামক ধ্বনি প্রভেদের সঙ্কর। বাচ্য অলঙ্কারের সঙ্গে সংসৃষ্টি হইতে হইলে, পদকে আশ্রয় করিয়াই সেইরূপ সংসৃষ্টি হইতে পারে, যেহেতু সেইখানে কোন কোন পদে বাচ্য অলঙ্কার থাকে আর কোন কোন পদে ধ্বনির প্রভেদ থাকে। যেমন—

"যেখানে সারসদের নিপুণ, মদোচ্ছ্বসিত কূজনকে বিস্তীর্ণ করিয়া প্রস্ফুট কমলের সুগন্ধের সঙ্গে সংস্পর্শের জন্য সুরভিত হইয়া সিপ্রা-নদীর বায়ু অঙ্গের অনুকূল হইতেছে এবং প্রিয়তমের মত চাটু প্রার্থনাপরায়ণ হইয়া সুরতগ্লানি গ্রহণ করিতেছে।"

এখানে 'মৈত্রী' পদে অবশ্যই অবিবক্ষিতবাচ্যধ্বনি আছে এবং অন্যান্য পদে অন্য বাচ্য অলঙ্কার আছে। সংসৃষ্টিযুক্ত অলঙ্কারসমূহের সঙ্গে সঙ্করের উদাহরণ, যেমন—

"আপনার শরীরে ঘন রোমাঞ্চ উদ্ভিন্ন হইয়াছে; রক্তলোলুপ সিংহ-বধূ সেই দেহে দাঁত দিয়া ক্ষতের সৃষ্টি করিতেছে এবং নখ দিয়া বিদীর্ণ করিতেছে। মুনিরা পর্য্যন্ত স্পৃহাযুক্ত হইয়া তাহা দেখিতেছে।"

এই যে শ্লোক এখানে সমাসোক্তি অলঙ্কারের সঙ্গে বিরোধ অলঙ্কারের সংসৃষ্টি হইয়াছে এবং তৎসঙ্গে অলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ্যধ্বনির সঙ্কর হইয়াছে, যেহেতু দয়াবীরসম্পর্কিত রস এখানে বাক্যের প্রধান অর্থ। সংসৃষ্টিযুক্ত অলঙ্কারের সঙ্গে সংসৃষ্টির উদাহরণ। যেমন—

"যে দিবসসমূহ অভিনব গর্জ্জনের সহিত শ্যামায়িত হইয়া পথিকদের কাছে রজনীর মত প্রতীয়মান হয় (অথবা যে দিবসসমূহে অভিনব প্রয়োগনৈপুণ্যবিশিষ্ট পথিকসামাজিকেরা বিচরণ করে) তন্মধ্যে

প্রসারিত গ্রীবাবিশিষ্ট (অথবা উল্লসিত গীত বিশিষ্ট) ময়ূরবৃন্দের নৃত্য শোভা পায়।"

এখানে উপমারূপকের সঙ্গে শব্দশক্ত্যুদ্ভব অনুরণনরূপব্যঙ্গ্যধ্বনির সংসৃষ্টি হইয়াছে।

**কে এইভাবে ধ্বনির প্রভেদ ও তাহার প্রভেদের প্রভেদ গণিতে পারে? আমরা মোটামুটিভাবে তাহাদের আভাস মাত্র দিলাম। ৪৪ ॥**

ধ্বনির প্রকারসমূহ অনন্ত। সহৃদয় ব্যক্তিদেব ব্যুৎপত্তির জন্য আমবা তাহাদের মোটামুটি বর্ণনা দিলাম।

**সৎকাব্য নির্ম্মাণ করিতে হইলে অথবা জানিতে হইলে সাধুজনেরা সম্যক্‌রূপে উদ্যোগী হইয়া উক্তলক্ষণযুক্ত ধ্বনির বিচার করিবেন। ৪৫ ॥**

সৎকবি এবং সহৃদয় ব্যক্তিরা উক্তস্বরূপবিশিষ্ট ধ্বনিব নিরূপণে নৈপুণ্য-লাভ করিলে সর্ব্বদাই কাব্যবিষয়ে প্রকর্ষ লাভ কবেন।

**এই যে কাব্যতত্ত্বের কথা যথোচিতভাবে বলা হইল তাহা অস্ফুটরূপে স্ফুরিত হইলে যাঁহারা সম্যক্‌রূপে তাহার বিশ্লেষণ করিতে পারেন নাই তাঁহারা রীতিসমূহের প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। ৪৬ ॥**

ধ্বনি-প্রবর্ত্তনের দ্বারা নির্ণীত কাব্যতত্ত্ব অস্ফুটভাবে স্ফুরিত হইলে যাঁহারা তাহা প্রতিপাদন করিতে পারেন নাই তাঁহারা বৈদর্ভী, গৌড়ী ও পাঞ্চালী রীতিসমূহের অবতাবণা করিয়াছেন। রীতিতত্ত্বেব যাঁহারা বিধান করিয়াছেন তাঁহাদের কাছে এই কাব্যতত্ত্ব অস্ফুটভাবে ঈষৎ স্ফুরিত হইয়াছে এইরূপ দেখা যায়। সেই রীতির লক্ষণ সম্পূর্ণ বিভিন্ন বলিয়া বিশদরূপে দেখাইবার কোন প্রয়োজন দেখি না।

**কাব্যের এই স্বরূপ জানা থাকিলে বৃত্তিগুলিও যথাযথরূপে প্রকাশিত হয়—কতকগুলি বৃত্তি শব্দতত্ত্ব আশ্রয় করিয়া থাকে আর কতকগুলিও অর্থতত্ত্বকে আশ্রয় করিয়া থাকে। ৪৭ ॥**

এই ব্যঙ্গ্যব্যঞ্জকভাবের বিচারযুক্ত কাব্যলক্ষণ জানা হইলে যে কতকগুলি শব্দতত্ত্ববিষয়ক উপনাগরিকাদি বৃত্তি আছে আর যে সকল অর্থতত্ত্বসম্পর্কিত কৈশিকী প্রভৃতি বৃত্তি আছে তাহারা সম্পূর্ণভাবে রীতি পদবী লাভ করে। নচেৎ সেই সকল বৃত্তিগুলি অদৃষ্ট অর্থের মত অশ্রদ্ধেয় হয়, অনুভবের দ্বারাই নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত হয় না। যদি এইরূপই হইল তবে এই ধ্বনির স্বরূপের লক্ষণ পরিষ্কার করিয়া নির্ণয় করা কর্ত্তব্য হইয়া দাঁড়ায়। কেহ কেহ ধ্বনির এইরূপ লক্ষণ করিয়াছেন—রত্নবিশেষের উৎকর্ষের মত কোন কোন শব্দ ও অর্থের রহস্যবিশেষ বোদ্ধা ব্যক্তিরা জানিতে পারেন; সুতরাং ইহাদের চারুত্ব অনির্ব্বচনীয় হইয়া প্রতিভাত হয় এবং সেইভাবেই কাব্যে ধ্বনির ব্যবহার হয়। এই যে ধ্বনির লক্ষণ করা হইয়াছে ইহা অসঙ্গত এবং বলার যোগ্যই নহে। যেহেতু, শব্দ যখন অর্থবিশেষকে না বুঝাইয়া স্বরূপকে আশ্রয় করিয়া থাকে তখন শ্রুতিকটু না হইলে তাহা নির্দ্দোষই থাকিয়া যায়। যখন শব্দ বাচকধর্ম্ম লাভ করে তখন তাহা প্রসাদগুণবিশিষ্ট হয় এবং তখন তাহার ব্যঞ্জকত্বও থাকে—ইহাই তাহার তাৎপর্য্য। স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হওয়া, ব্যঙ্গ্যের অনুগামী হওয়া আর ব্যঙ্গ্য অংশের সহকারিতা লাভ করা—অর্থের ইহাই বৈশিষ্ট্য। সেই যে দুই বৈশিষ্ট্য তাহা ব্যাখ্যা করা যায় এবং বহুভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ইহা ছাড়া যে অনির্ব্বচনীয়তারূপ বৈশিষ্ট্যের কল্পনা করা হইয়াছে বিবেচনা-বুদ্ধির শৈথিল্যের জন্যই তাহা সম্ভব হইয়াছে; যেহেতু অনির্ব্বচনীয়ত্বের দ্বারা ইহাই বুঝান হয় যে ইহা সকল শক্তির অগোচর। এই অনির্ব্বচনীয়ত্ব কোন বস্তুর পক্ষেই হইতে পারে পারে না; যেহেতু অন্ততঃ 'অনির্ব্বচনীয়' শব্দের দ্বারা তাহার বর্ণনা সম্ভব।

কোথাও বলা হয় যে সাধারণ লক্ষণ স্পর্শ করা হইয়াছে কিন্তু বিশেষের জ্ঞান জন্মাইতেছে না, শব্দের যে এইরূপ প্রকাশমানত্ব তাহাকেই অনির্ব্বচনীয়ত্ব বলে। এইরূপ অনির্ব্বচনীয়ত্ব রত্নের বৈশিষ্ট্যের ন্যায় কাব্যের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে প্রযোজ্য নহে, যেহেতু লক্ষণকারকেরা কাব্যের রূপ বিশ্লেষণ করিয়াছেন এবং রত্নের বৈশিষ্ট্যসম্পর্কে দেখি যে জাতিনির্ণয়ের সম্ভাবনার দ্বারাই মূল্যের নিশ্চিত পরিকল্পনা করা হয়। কিন্তু ইহারা উভয়েই যে বোদ্ধা বিশেষের কাছে জ্ঞেয় হয় তাহা ঠিকই। জহুরীরা রত্নের তত্ত্ব জানেন, এবং সহৃদয় ব্যক্তিরাই কাব্যের রস উপলব্ধি করেন—ইহাতে কাহার সংশয় আছে? সকল বস্তুরই লক্ষণ নির্ণয় কবিতে গেলে দেখা যাইবে যে তাহা অনির্দ্দেশ্য—এই বৌদ্ধমত প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে। অন্য গ্রন্থে বৌদ্ধমতের পরীক্ষা প্রসঙ্গে এই যুক্তির বিচার করিব। অন্য গ্রন্থে যাহা শোনা যাইবে তাহার অংশ প্রকাশ করিলে সহৃদয় ব্যক্তিদের মন বিরূপ হইতে পারে বলিয়া সেই প্রচেষ্টা করা হইল না। অথবা ইহা বলা যাইতে পারে যে বৌদ্ধমতে যাহা প্রত্যক্ষের লক্ষণ তাহাই ধ্বনির লক্ষণ হইবে। সেইজন্যই ধ্বনির অন্য লক্ষণ করা সম্ভব হয় না বলিয়া এবং তাহা বাচ্য অর্থের অধিগম্য নহে বলিয়া যে লক্ষণ বলা হইয়াছে তাহাই যুক্তিযুক্ত। সেইজন্যই ইহা বলা হইয়াছে—

ধ্বনি নিশ্চিতরূপে আখ্যানযোগ্য। তাহার মধ্যে অনির্ব্বচনীয় কিছু প্রকাশ পায়—এইরূপ লক্ষণ ধ্বনিতে প্রযোজ্য নহে। ইহার যেরূপ লক্ষণ বলা হইল তাহা সাধু।

ইতি শ্রীরাজানক আনন্দবর্দ্ধনাচার্য্যবিরচিত ধ্বন্যালোকে তৃতীয় উদ্দ্যোত।

# চতুর্থ উদ্দ্যোত

সন্দেহের নিরাকরণের জন্য এইভাবে সবিস্তারে ধ্বনির নিরূপণ করিয়া তাহার নিরূপণের অন্য প্রয়োজন বলিতেছেন—

**উক্ত ধ্বনির যে পথ প্রদর্শিত হইল ইহার দ্বারা কবিদের প্রতিভা অনন্ততা লাভ করে। ১ ॥**

ধ্বনি ও গুণীভূতব্যঙ্গ্যের এই যে মার্গ প্রকাশিত হইল ইহার অপর ফল এই যে ইহার দ্বারা কবিপ্রতিভা অনন্ততা প্রাপ্ত হয়। যদি প্রশ্ন করা হয় কেমন করিয়া তাহা সম্ভবপর হয় :—

**যেহেতু পূর্ব্বকবিদের বাক্যার্থসমন্বিত হইলেও কোন কবির বাণী ইহাদের কোন একটি প্রকারের দ্বারা বিভূষিত হইয়াই নবীনতা লাভ করে। ২ ॥**

যেহেতু ধ্বনির যে সকল প্রভেদের কথা বলা হইল কবির বাণী তাহাদের যে কোন একটির দ্বারা বিভূষিত হইলে তাহা পুরাতন কবিদের দ্বারা নিবদ্ধ অর্থের সঙ্গে সংযুক্ত হইলেও নবীনতা লাভ করে। অবিবক্ষিতবাচ্যধ্বনির যে দুইটি প্রকার আছে তাহারা পূর্ব্বকবিদের অর্থের অনুগমন করা সত্ত্বেও যে নবীনতা লাভ করা যায় তাহার উদাহরণ দেওয়া হইতেছে—

"যে মৃগনয়না নায়িকা তারুণ্য স্পর্শ করিতেছে তাহার হাস্য কিঞ্চিৎ মুগ্ধ; তাহার দৃষ্টিবিভব তরলমধুর। তাহার বাগ্‌বিস্তার অভিনব-বিলাসোক্তিতে লীলায়িত, তাহার সঞ্চরণ নবপত্রশোভায় সুশোভিত—ইহার কার্য্যকলাপে এমন কি আছে যাহা মনোহারী নহে?"

১ ইহার অর্থ নিম্নলিখিত শ্লোকের অর্থের মধ্যে নিহিত আছে—

"লোলনয়না, স্খলিতবাক্, বিভ্রমবিলাসযুক্ত হাস্যসমন্বিত, নিতম্বভারে অলস-গামিনী কামিনীরা কাহার না প্রিয় হয় ?"

কিন্তু এইরূপ হইলেও তিরস্কৃতবাচ্যধ্বনির আশ্রয় গ্রহণ করায় প্রথমোদ্ধৃত শ্লোকে কবিপ্রতিভার নবীনতাই প্রতিভাত হয়। সেইরূপ—

"যে প্রথম সে প্রথমই। তাই নিহত হস্তীর মাংসভোজী সিংহ সিংহই; পশুসমাজে কে তাহাকে হীন করিতে পারে ?"

ইহার অর্থ নিম্নলিখিত শ্লোকে নিহিত আছে—

"স্বীয় তেজে যাহার মহিমা আহৃত হইয়াছে তাহাকে কে অতিক্রম করিতে পারে ? মহাগৌববশালী হইলেও কি মাতঙ্গেবা সিংহকে অভিভূত করিতে পারে ?"

কিন্তু এইরূপ হইলেও অর্থান্তরসংক্রমিতবাচ্যধ্বনির সংযোগবশতঃ প্রথম শ্লোকে অভিনবত্ব আনীত হয়।

এই প্রকারে বিবক্ষিতান্যপরবাচ্যধ্বনিতেও নবীনতা আরোপিত হয়। যেমন—

"স্বামী নিদ্রার ভান করিয়া শুইয়া ছিল। বধূ তাহার মুখে মুখ রাখিয়া চুম্বনের আকাঙ্ক্ষা নিরুদ্ধ করিয়া চুপ করিয়া ছিল, কারণ তাহার ভয় হইতেছিল যে স্বামী জাগিয়া যাইতে পারে এবং স্বামী নিদ্রা যাইতেছে কিনা তাহা বারংবার পরীক্ষা করিতে করিতে তাহার দেহে চঞ্চলতার লক্ষণ দেখা যাইতেছিল। 'আমি জাগিয়া উঠিলে সে লজ্জায় বিমুখী হইবে' ইহা মনে করিয়াও চুম্বনের প্রচেষ্টা করে নাই। স্বামীর আশঙ্কাযুক্ত হৃদয় রতির চরমপরিণতিই প্রাপ্ত হইয়াছিল।"

এই শ্লোকে নিম্নলিখিত শ্লোকের অর্থ নিহিত আছে—

"বাসগৃহ শূন্য দেখিয়া বালিকাবধূ আস্তে আস্তে শয্যা হইতে উঠিয়া কপটনিদ্রামগ্ন স্বামীর মুখ অনেকক্ষণ যাবৎ দেখিল এবং তৎপরে

নিশ্চিন্তচিত্তে তাহাকে পরিচুম্বন করিল। চুম্বন করিয়া দেখিল যে স্বামীর গণ্ডস্থল রোমাঞ্চিত হইয়াছে। ইহাতে সে লজ্জায় অবনতমুখী হইলে স্বামী হাসিয়া তাহাকে অনেকক্ষণ ধরিয়া চুম্বন করিল।"

ইহা সত্ত্বেও প্রথম শ্লোকে নবীনতা আছে। অথবা যেমন "তরঙ্গ-ভ্রূভঙ্গা" ইত্যাদি শ্লোক "নানাভঙ্গিভ্রমদ্‌ভ্রূঃ" ইত্যাদি অপেক্ষা নূতন।

**বহুপ্রসারশালী রসাদি এই যুক্তি অনুসারে উদাহরণীয়। রসাদির আশ্রয়ে কাব্যের নানা প্রকারের পরস্পর মিশ্রণের জন্য কাব্যমার্গ অনন্ততা প্রাপ্ত হয়। ৩।**

কাব্যের মার্গ রস, ভাব, তাহাদের আভাস ও প্রশমনের লক্ষণযুক্ত, ইহাদের অন্তর্গত বিভাব, অনুভাব প্রভৃতির গণনা করিলে কাব্যমার্গ বহুব্যাপকতা লাভ করে। ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। সেই সকল বিষয় এই যুক্তি অনুসারে উদাহরণীয়। যাহার অর্থাৎ রসাদির আশ্রয়ে প্রাচীন কবিগণ সহস্র বা অসংখ্য উপায়ে সঞ্চরণ করিয়াছেন; সেইজন্য ইহাদের পরস্পরের মিশ্রণে অনন্ততা লাভ হয়। রসভাবাদির প্রত্যেকে বিভাবানুভাবব্যভিচারীদের আশ্রয়ে অপরিমিত হইয়া থাকে। জগৎব্যাপার নিজের ভাবে অবস্থিত থাকে, কিন্তু সুকবিরা রসভাবাদির একটি প্রভেদানুসারে জগৎব্যাপার রচনা করিলে সেই সমগ্র ব্যাপার কবিদের ইচ্ছানুসারে অন্যভাবে পরিবর্ত্তিত হয়। চিত্র (কাব্যের) বিচারের অবসরে ইহাও প্রতিপাদিত হইয়াছে। এই অর্থ বুঝাইবার জন্য এই গাথাও মহাকবি কর্ত্তৃক বিরচিত হইয়াছে—

"যে অর্থ যেরূপভাবে নাই কবির বাণী তাহাকে সেইরূপ ভাবেই হৃদয়ে প্রবেশ করাইয়া অপরিসীমতা লাভ করিয়া উৎকর্ষ প্রাপ্ত হয়।"

সুতরাং এইভাবে রসভাবাদির আশ্রয়ে কাব্যের অর্থের অনন্ততা সুপ্রমাণিত হইয়াছে। ইহা বুঝাইবার জন্যই বলা হইতেছে—

**যেমন বসন্তকালে পুরাতন বৃক্ষ নূতন করিয়া বিকশিত হয়, সেইরূপ অর্থসমূহ পূর্ব্বদৃষ্ট হইলেও কাব্যে রস-পরিগ্রহ করিয়া সবই নূতন বলিয়া প্রতিভাত হয়। ৪ ॥**

এইভাবে দেখা যায় যে বিবক্ষিতান্যপরবাচ্যধ্বনিই শব্দশক্ত্যুদ্ভব অনুরণনরূপ ব্যঙ্গ্যপ্রকারের সমাশ্রয়ে অভিনবত্ব লাভ করে। যেমন—

"শেষনাগ, হিমগিরি এবং তুমি—তোমরা মহান্ গৌরবশালী এবং তোমরা স্থির হইয়া অবস্থান করিতেছ, যেহেতু তোমরা চলমান পৃথিবীকে সীমা অতিক্রম করিতে না দিয়া তাহাকে বহন করিতেছ।"

এই শ্লোকটি থাকা সত্ত্বেও "ধরণীধারণায়াধুনা ত্বং শেষঃ" এই বাক্যে অভিনবত্ব আছে। এই প্রকারের ধ্বনিতেই অর্থশক্ত্যুদ্ভব অনুরণনরূপ ব্যঙ্গ্যের আশ্রয়ে নবীনতা হয়। যেমন—

"বর-সম্বন্ধীয় কথার আলাপ হইলে কুমারীরা অন্তর্লজ্জায় অবনতমুখী হইয়া দেহে পুলক-সঞ্চারের দ্বারা নিজের প্রণয়াভিলাষ, সূচিত করে।" ইত্যাদি শ্লোক থাকা সত্ত্বেও 'এবংবাদিনি দেবর্ষৌ' ইত্যাদি অভিনবত্ব লাভ করে। অর্থশক্ত্যুদ্ভব অনুরণনরূপব্যঙ্গ্যধ্বনিতে কবিপ্রসিদ্ধিসম্পন্ন উক্তির দ্বারা কাব্যশরীর নির্মিত হয় বলিয়া এই শ্লোকের অভিনবত্ব সম্পাদিত হইয়াছে। যেমন—

"বসন্তকাল আরম্ভ হইলে আম্রকলিকার সহিত অনুরাগীদের উৎকণ্ঠা সহসা সঞ্জাত হয়।"

ইত্যাদি শ্লোক থাকা সত্ত্বেও 'সজ্জেইস্থরহিমাসো' ইত্যাদি অবশ্যই অপূর্ব্বত্ব লাভ করে।

অর্থশক্ত্যুদ্ভব অনুরণনরূপ ব্যঙ্গ্যধ্বনিতে কবিকল্পিত বক্তার উক্তি প্রসিদ্ধিমাত্রের দ্বারা নবত্ব লাভ হয়। যেমন—

"আমার পুত্র একমাত্র বাণের দ্বারা লক্ষ্য বিদ্ধ করিতে পারিত; সে পূর্ব্বে হস্তিনীদের বৈধব্যের কারণ ছিল। হতভাগিনী বধূ তাহাকে

এমন করিয়া দিয়াছে যে সে এখন বাণের আধার তূণীরমাত্র বহন করে।” ইত্যাদি শ্লোক থাকা সত্ত্বেও “বাণিঅঅহত্থিদন্তা” ইত্যাদি গাথার অর্থের অভিনবত্ব খণ্ডিত হয় নাই।

যেমন ব্যঙ্গ্যপ্রভেদের আশ্রয়ে ধ্বনিকাব্যের অর্থসমূহের নবীনতা সম্পাদিত হয় সেইরূপ ব্যঞ্জকের প্রভেদের আশ্রয়েও হইতে পারে। গ্রন্থবিস্তারের ভয়ে তাহা লক্ষিত হইল না; সহৃদয় ব্যক্তিরা নিজেরাই বুঝিয়া লইবেন। পুনঃ পুনঃ উক্ত হইলেও সারাংশ বলিয়া ইহা এখানে কথিত হইতেছে—

**এই ব্যঙ্গ্যব্যঞ্জকভাব বিবিধ হইতে পারে এইরূপ সম্ভাবনা থাকিলেও কবি এক রসাদিময় ব্যঙ্গ্যব্যঞ্জকভাবে যত্নবান্ হইবেন। ৫ ॥**

এখানে অর্থাৎ অনন্ততার হেতু, ব্যঙ্গ্যব্যঞ্জক যে সম্বন্ধ তাহার বিচিত্ররূপ সম্ভব হইলেও অপূর্ব্ব অর্থলাভেচ্ছু কবি এক রসাদিময় ব্যঙ্গ্যব্যঞ্জকভাবে যত্নবান্ হইবেন। রস, ভাব, তদাভাসরূপ ব্যঙ্গ্য এবং তাহার বর্ণপদ—বাক্যরচনাপ্রবন্ধরূপ ব্যঞ্জকে যে কবি অবহিতমনা হইয়াছেন তাঁহার পক্ষে সবই অপূর্ব্ব কাব্যরূপে প্রতিপন্ন হয়। সেই জন্যই রামায়ণমহাভারতাদিতে সংগ্রামাদি পুনঃ পুনঃ বর্ণিত হইলেও অভিনবরূপে প্রকাশিত হয়। কাব্যপ্রবন্ধে এক অঙ্গী রস নিবদ্ধ হইয়া অর্থবিশেষপ্রতিপত্তির এবং অতিশয় শোভার পোষকতা করে। যদি প্রশ্ন করা হয়, কোথায় এইরূপ হয় তাহা হইলে উত্তর দিব—যেমন রামায়ণে বা মহাভারতে। “শোকঃ শ্লোকত্বমাগতঃ” ( ১।৫ )—ইহা বলিয়া দেখান হইয়াছে যে স্বয়ং আদিকবি রামায়ণে করুণরসের প্রাধান্য দিয়াছেন। তিনি স্বীয় কাব্যে সীতার তিরোভাব পর্য্যন্ত বর্ণনা দিয়া ইহা নিঃশেষে প্রতিপন্ন করিয়াছেন। কাব্যশোভাশালী মহাভারতেও মহামুনি যাদব ও পাণ্ডবদের সম্পূর্ণ তিরোধানজনিত সংহার বিতৃষ্ণাদায়িনী সমাপ্তির বর্ণনা দিয়া দেখাইয়াছেন

যে মোক্ষই পরমপুরুষার্থ এবং শান্তরসই তদীয় কাব্যের প্রধান বক্তব্য বিষয়। অন্য ব্যাখ্যাকারেরা এই সকল কথা আংশিকভাবে বিবৃত করিয়াছেন। সত্ত্ব ও রজোভাব যেখানে অভিভূত হইয়াছে সেই মহামোহে মগ্ন লোকসমাজকে অতিবিমল জ্ঞানালোকদায়ী লোকনাথ উদ্ধার করিতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন; তিনি নিজেই—

"সারহীন লৌকিক পদার্থসমূহ যেমন যেমন ভাবে বিপর্য্যয় লাভ করে তেমন তেমন ভাবে দর্শকের মনে বৈরাগ্য সঞ্জাত হয়; উহাতে সংশয় নাই।"

ইত্যাদি বহুবার বলিয়া এই বিষয়ের সম্যক্ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ইহা হইতে মহাভারতের তাৎপর্য্য সুস্পষ্ট হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে—অন্য রস শান্তরসের অঙ্গ হইয়া তাহার অনুগমন করিতেছে, অন্য পুরুষার্থ মোক্ষের অনুগমন করিয়া তাহার অঙ্গ হইয়াছে। রসসমূহের মধ্যে যে অঙ্গাঙ্গিভাব থাকে তাহা প্রতিপাদিতই হইয়াছে। শরীর আত্মার অঙ্গ, কিন্তু যখন তাহাকে আত্মার উপরে নির্ভরশীল বলিয়া মনে করা হয় না তখন তাহার নিজের প্রাধান্য অনুসারে তাহার চারুত্বের বিচার করিলেও বিরোধিতা হয় না। সেইরূপ নিহিত পারমার্থিক তত্ত্বের অপেক্ষা না করিয়া অঙ্গভূত রস এবং পুরুষার্থের নিজের প্রাধান্য অনুসারে চারুত্ব-বিচারে কোন বিরোধিতা হয় না। আপত্তি হইতে পারে—মহাভারতের যে বক্তব্য বিষয় তাহা সবই অনুক্রমণিকায় কথিত হইয়াছে; সেইখানে এইরূপ কিছুই দেখা যায় না। বরং সেইখানে অনুক্রমণিকায় শব্দের দ্বারা সোজাসুজিভাবে ইহাই বুঝান হইয়াছে যে মহাভারত সকল পুরুষার্থের হেতু এবং সর্ব্বরসের আকর। এই প্রসঙ্গে বলা হইতেছে—মহাভারতে শান্তরস যে সকল রসের অঙ্গী, মোক্ষ যে অন্য সকল পুরুষার্থ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অনুক্রমণিকায় ইহা সত্যই শব্দের দ্বারা সোজাসুজিভাবে অভিহিত হয় নাই; কিন্তু "এখানে বাসুদেব এবং সনাতন ভগবানও

কীর্ত্তিত হইতেছেন"—এই বাক্যে ইহা ব্যঙ্গ্যরূপে দেখান হইয়াছে। ইহার দ্বারা এই অর্থই ব্যঙ্গ্যরূপে বিবক্ষিত হইয়াছে যে ইহাতে যে পাণ্ডবাদি চরিত্র বিরচিত হইয়াছে তাহার উদ্দেশ্য হইতেছে সকলের অবসানজনিত বৈরাগ্য এবং অবিদ্যাপ্রপঞ্চের কথন; পারমার্থিক সত্য হিসাবে ভগবান বাসুদেব কীর্ত্তিত হইয়াছেন। সুতরাং সেই পরমেশ্বর ভগবানেই তোমরা সমাহিত-চিত্ত হও; সারহীন ঐশ্বর্য্যসমূহে অনুরাগী হইও না অথবা কেবল নয়বিনয়পরাক্রমাদি কোন গুণে তোমরা একাগ্রমনে অভিনিবিষ্ট হইও না। "সংসারের নিঃসারতা দেখিও"—পরের শ্লোকে এইরূপ অর্থ প্রকাশ করিয়া ব্যঞ্জকশক্তির দ্বারা অনুগৃহীত শব্দ স্ফুট হইয়া অবভাসিত হয়। পরে—"স হি সত্যম্" প্রভৃতি যে সকল শ্লোক পরিলক্ষিত হয় এবংবিধ অর্থ তাহাদের অভ্যন্তরে নিহিত রহিয়াছে।

কবিপ্রজাপতি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন মহাভারতের শেষে হরিবংশের বর্ণনায় এই বিষয়ের সমাপ্তি করিয়া নিজেই এই রমণীয় নিগূঢ় অর্থ সম্যক্ প্রস্ফুট করিয়াছেন। অর্থের দ্বারা তিনি সংসারাতীত পরম তত্ত্বে অতিশয় ভক্তির প্রবর্ত্তনা করায় সকল সাংসারিক ব্যবহারই খণ্ডনযোগ্য বলিয়া সম্পূর্ণভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। দেবতা, তীর্থ, তপস্যা প্রভৃতির এবং অন্য দেবতাবিশেষের প্রভাবাতিশয্যের বর্ণনা সেই পরব্রহ্মলাভের উপায় বা তাঁহার বিভূতি হিসাবে সন্নিবেশিত হইয়াছে। পাণ্ডবাদির চরিত্র বর্ণনায় তাৎপর্য্য এই যে তাহা বৈরাগ্য জন্মায় ও বৈরাগ্য মোক্ষমূলক; এবং গীতাদিতে দেখান হইয়াছে যে মোক্ষ প্রধানতঃ ভগবান্‌কে পাইবার উপায়। সুতরাং পাণ্ডবাদিচরিত্রবর্ণনায়ও উদ্দেশ্য পরব্রহ্মলাভই। অপরিমিত শক্তির আকর পরব্রহ্ম মথুরায় যে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন সেই অবতার অন্য সকল স্বরূপকে নিন্দিত করিয়াছে; তাই তিনি লোকপরম্পরায় বাসুদেব নামে সংজ্ঞিত হইয়াছেন এবং গীতাদি স্থানে সেই নামেই প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। তদ্দ্বারা সমগ্র পরব্রহ্মকেই বুঝান হইয়াছে, শুধু

মথুরায় প্রাদুর্ভাবের অংশ বুঝান হয় নাই, কারণ তিনি 'সনাতন'-শব্দের দ্বারা বিশেষিত হইয়াছেন এবং রামায়ণাদিতে ভগবানের অন্য মূর্ত্তিতে এই 'বাসুদেব' সংজ্ঞার প্রয়োগ দেখা যায়। বৈয়াকরণেরা এই অর্থই নির্ণীত করিয়াছেন।

সুতরাং অনুক্রমণিকায় নির্দ্দিষ্ট বাক্যের দ্বারা ভগবদ্ব্যতিরিক্ত অন্য সমস্ত বস্তুর অনিত্যতা প্রকাশ করা হইয়াছে এবং শাস্ত্রমার্গে ইহা দেখান হইয়াছে যে মোক্ষ একমাত্র পরম পুরুষার্থ; কাব্যমার্গের দিক্ দিয়াও ইহা সুপ্রমাণিত হইয়াছে যে তৃষ্ণাক্ষয়সমন্বিত সুখের পরিপুষ্টিলক্ষণযুক্ত শান্তরস মহাভারতের অঙ্গী রস বলিয়া বিবক্ষিত হইয়াছে। এই যে অর্থ যাহা একেবারে সারভূত তাহা ব্যঙ্গ্যরূপেই দর্শিত হইয়াছে, বাচ্যরূপে নহে। সারভূত এই অর্থ স্ববোধক শব্দের দ্বারা সোজাসুজিভাবে প্রকাশিত না হইয়া অতিশয় শোভা আনয়ন করিতেছে। বিদগ্ধ পণ্ডিতসমাজে এইরূপ প্রসিদ্ধিও আছে যে অধিকতর অভীষ্ট বস্তু ব্যঙ্গ্য হইয়াই প্রকাশিত হয়। সাক্ষাৎ শব্দের দ্বারা বাচ্য হয় না। সুতরাং ইহা নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত হইল—অঙ্গীভূত রসাদির আশ্রয়ে কাব্য রচিত হইলে নূতন অর্থলাভ হয় এবং রচনা অতিশয় শোভাসম্পন্ন হয়। অতএব লক্ষণীয় উদাহরণেও দেখা যায় যে রসের অনুগামী অর্থ রচনা করিলে বিশেষ কোন অলঙ্কার না থাকিলে তাহা অতিশয় শোভাযুক্ত হয়। যেমন—

"ঘটজন্মা যোগিশ্রেষ্ঠ মহাত্মা অগস্ত্যমুনি সর্ব্বজয়ী; তিনি এক কোষে ভগবানের অবতার মৎস্য ও কূর্ম্ম এই উভয় রূপকেই দেখিতে পাইয়াছিলেন।" ইত্যাদিতে।

এইখানে অদ্ভুত রসের অনুগামী মৎস্য-কচ্ছপদর্শন অতিশয় শোভা-পরিপোষক হইয়াছে। অদৃষ্টপূর্ব্ব ও অশ্রুতপূর্ব্ব বলিয়া ভগবানের অবতার মৎস্য ও কূর্ম্ম দর্শন সমুদ্রের নৈকট্য হইতেও অদ্ভুত রসের সমধিক অনুকূল হইয়াছে। যে বস্তু পূর্ব্বদৃষ্ট ও পূর্ব্বশ্রুত তাহা লোকপ্রসিদ্ধি অনুসারে অদ্ভুত

হইলেও আশ্চর্য্যজনক হয় না। যাহা অদৃষ্টপূর্ব্ব ও অশ্রুতপূর্ব্ব তাহা যে অদ্ভুতরসেরই অনুগামী হয় তাহা নহে, অন্য রসেরও হয়। তাই যেমন—

"হে সুভগ, তুমি তাহার যে ক্ষীণ পার্শ্ব স্পর্শ করিয়া অকস্মাৎ অতিক্রান্ত হইয়াছিলে সেই পার্শ্ব অদ্যাপি স্বেদযুক্ত, রোমাঞ্চিত ও কম্পিত হইতেছে।"

এই গাথার অর্থ চিন্তা করিলে যে শৃঙ্গার রসপ্রতীতি হয়, "সে তোমাকে স্পর্শ করিয়া স্বেদযুক্ত, রোমাঞ্চিত ও কম্পিত হয়"—এবংবিধ অদ্ভুত রসাত্মক প্রতীয়মান অর্থ হইতে তাহা একটুও হয় না।

সুতরাং ধ্বনিকাব্যপ্রভেদের সমাশ্রয়ে যে ভাবে কাব্যার্থের অভিনবত্ব হয় তাহা এমনি করিয়া প্রতিপন্ন করা হইল। ত্রিভেদবিশিষ্টব্যঙ্গ্যের উপরে নির্ভর করায় গুণীভূতব্যঙ্গের যে সকল প্রভাবভেদ হইয়া থাকে তাহার সমাশ্রয়েও কাব্যবস্তুসমূহের নবত্ব হইয়াই থাকে। তাহার উদাহরণ দেওয়া হইল না, কারণ সেইরূপ করিতে গেলে গ্রন্থ অতিশয় বিস্তারিত হইয়া পড়ে; সহৃদয় ব্যক্তিরা নিজেরাই বুঝিয়া লইবেন।

**যদি প্রতিভাগুণ থাকে তাহা হইলে ধ্বনি ও গুণীভূতব্যঙ্গ্যের সমাশ্রয়ে কাব্যার্থের বিরাম হয় না। ৬ ॥**

যদি প্রতিভাগুণ থাকে তাহা হইলে পুরাতন কাব্যপ্রবন্ধ থাকিলেও নূতন কাব্যের অর্থ অনন্ততা লাভ করে। আর তাহা না থাকিলে, কবির কোন কিছু বস্তুই থাকে না। অর্থদ্বয়ের অনুরূপ শব্দসন্নিবেশকে রচনার শোভা বলা যাইতে পারে, অর্থরচনার প্রতিভার অভাবে তাহা কেমন করিয়া উৎপন্ন হইবে? অর্থাবশেষের অপেক্ষা না করিয়া যদি অক্ষরসন্নিবেশকেই রচনার শোভা মনে করা যায় তাহা হইলে তাহা সহৃদয় ব্যক্তির মনঃপূত হইবে না। এইরূপ মনে করা হইলে অর্থের বিচার না করিয়া শুধু চতুর ও মধুর রচনাকেও কাব্য আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। যখন শব্দ ও অর্থের সংযোগের দ্বারা কাব্যত্ব লাভ হয়

তখন তথাবিধ বিষয়ে কেমন করিয়া কাব্যব্যবস্থা হইবে? যদি এইরূপ আশঙ্কা করা হয়, তাহা হইলে বলা যাইতে পারে—যে কাব্যের অর্থ অপরের দ্বারা নিবদ্ধ হইয়াছে তাহার সম্পর্কে যেমন কাব্যত্বের প্রয়োগ হয়, তথাবিধ সন্দর্ভসমূহের সম্পর্কেও সেইরূপ হইয়া থাকে।

শুধু যে ব্যঙ্গ্য অর্থের অনুসারেই অর্থের অনন্ততা হয় তাহা নহে যেহেতু বাচ্য অর্থের অনুসারেও হইতে পারে; ইহা প্রতিপাদন করিবার জন্য বলা হইতেছে—

**শুদ্ধ বাচ্য অর্থেরও অবস্থা-দেশ-কালাদি বৈশিষ্ট্যের দ্বারা স্বভাবতঃ অনন্ততা হইয়া থাকে। ৭॥**

শুদ্ধ অর্থাৎ ব্যঙ্গ্যের উপরে যাহার অপেক্ষা নাই এইরূপ বাচ্যার্থের অবশ্য স্বভাবতঃই অনন্ততা হইয়া থাকে। বাচ্য অর্থের স্বভাবই এই যে চেতন ও অচেতন পদার্থের অবস্থাভেদ, দেশভেদ, কালভেদ ও স্বরূপভেদ হইতে অনন্ততা হয়। তাহারা ঐরূপভাবে ব্যবস্থাপিত থাকে বলিয়া প্রসিদ্ধ অনেক স্বভাবের অনুকরণকারী স্বভাবোক্তির দ্বারা যে কাব্যার্থ রচিত হয় তাহারও অবধি থাকে না। তাই অবস্থাভেদে নবত্ব যেমন—কুমারসম্ভবে "সর্ব্বোপমাদ্রব্যসমুচ্চয়েন" ইত্যাদি (১।৪৯) উক্তির দ্বারা প্রথমে পার্ব্বতীর রূপবর্ণনা পরিসমাপ্ত হইয়া গেলেও পরে তিনি শম্ভুর নয়নগোচর হইলে "বসন্তপুষ্পাভরণং বহন্তী"—ইত্যাদি (৩.৫৩) উক্তির দ্বারা অন্য ভঙ্গীতে তাঁহাকে মন্মথের উপকরণরূপে বর্ণিত করা হইয়াছে। আবার নবপরিণয় সময়ে তাঁহাকে প্রসাধন করা হইতে থাকিলে "তাং প্রাঙ্মুখীং তত্র তন্বীম্"—ইত্যাদি (৭।১৩) উক্তির দ্বারা নূতন রকমে তাঁহার রূপসৌষ্ঠব নির্ণীত হইয়াছে। সেই কবির সেই একাধিক বর্ণনাভঙ্গী পুনরুক্তি বলিয়া মনে হয় না, অথবা তাহারা নূতন নূতন অর্থের উপয় নির্ভর করিতেছে না এইরূপও মনে হয় না। বিষমবাণলীলায় ইহা দর্শিতই হইয়াছে—"সুকবিদের বাণী এবং প্রিয়াদের ভাববিলাসসমূহ,

ইহাদের অবধিও নাই এবং ইহাদের মধ্যে পুনরুক্তিও দেখা যায় না।"

অবস্থাভেদের আর একটি প্রকার এই যে, হিমালয় ও গঙ্গাদি সকল অচেতন পদার্থের সচেতন রূপ পরিকল্পিত হয় এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে। সেই অচেতন স্বরূপে দ্বিতীয় চেতনাবিশিষ্ট স্বরূপ যোজনা করিয়া কাব্য রচনা করিলে তাহা অপূর্ব্ব বলিয়াই প্রকাশিত হয়। যেমন কুমারসম্ভবেই পর্ব্বতস্বরূপ হিমালয়ের বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে আবার হিমালয় সপ্তর্ষিগণের প্রিয় এইরূপ উক্তিতে তাঁহার যে চেতনাবিশিষ্ট স্বরূপ প্রদর্শিত হইয়াছে তাহা অপূর্ব্ব হইয়াই প্রতিভাত হয়। সৎকবিদের এই মার্গের প্রসিদ্ধিও আছে। কবিদের ব্যুৎপত্তির জন্য এই পদ্ধতি 'বিষমবাণলীলা'য় সবিস্তারে দর্শিত হইয়াছে। সচেতন প্রাণীদের বাল্য প্রভৃতি অবস্থার বর্ণনায় যে অভিনবত্ব থাকে তাহা সৎকবিদের কাছে প্রসিদ্ধই। সচেতন প্রাণীদের অবস্থাভেদের মধ্যেও অপ্রধান অবস্থাভেদে নূতনত্ব হয়। যেমন কুমারীদের বা অন্য রমণীদের হৃদয় কুসুমশরের দ্বারা বিদীর্ণ হইলে এই বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়। সেইখানেও বিদগ্ধস্বভাবা ও অবিদগ্ধস্বভাবা রমণী—এই উভয় পক্ষে বিভিন্নতা হয়। অচেতন বস্তুসমূহ যাহারা আরম্ভাদি অবস্থাভেদে বৈচিত্র্যলাভ করে তাহাদের স্বরূপ একটি একটি করিয়া বর্ণনা দিলে অনন্ততা লাভ হয়। যেমন—

১ "যে সমস্ত মৃণালসমূহ ভক্ষিত হইয়া শব্দায়মান হংসসমূহের কণ্ঠরবের সংস্পর্শ লাভ করে বলিয়া এক অপূর্ব্ব ঘর্ঘর শব্দবিলাস ঘটিয়া থাকে তাহারা সম্প্রতি হস্তিনীর নবোদ্ভিন্ন মৃদু দন্তাঙ্কুরের তুল্য শুভ্রতা লাভ করিয়া কমলিনীর প্রথম অঙ্কুররূপে সরোবরে আবির্ভূত হইল।"

অন্য জায়গায়ও এই রীতি অনুসরণ করিতে হইবে। দেশভেদ হইতে সমগ্র অচেতন পদার্থসমূহ বিচিত্রতা লাভ করে। যেমন নানা দিগেশবিহারী বায়ুসমূহের এবং সলিল, কুসুম প্রভৃতি অন্যান্য বস্তুরও বৈচিত্র্য প্রসিদ্ধই। পশু, পক্ষী প্রভৃতি সচেতন প্রাণীরাও গ্রাম, অরণ্য,

জল প্রভৃতির সঙ্গে সংযুক্ত হইয়া পরস্পরের মধ্যে যে অতিশয় পার্থক্য লাভ করে তাহা দেখাই যায়। বিবেচনা সহকারে এই পার্থক্য যথাযথ রচনা করিলে তাহা সেই ভাবেই অনন্ততা লাভ করে। সেই ভাবেই বলা যাইতে পারে—দিগ্দেশাদির জন্য বিভিন্নতাপ্রাপ্ত মানুষদের ব্যবহার ও ব্যাপারাদিতে যে বিচিত্র বৈশিষ্ট্য দেখা যায় কে তাহার শেষ পর্য্যন্ত যাইতে পারে? বিশেষ করিয়া রমণীদের। সুকবিরা স্বীয় প্রতিভানুসারে এই সকল বিষয় রচনা করেন।

কালভেদ হইতেও বৈচিত্র্য লাভ হয়। যেমন ঋতুভেদ হইতে দিক্, ব্যোম, জল প্রভৃতি অচেতন বস্তুদের। সচেতন বস্তুদের কালবিশেষানুসারে যে ঔৎসুক্যাদি হয় তাহা প্রসিদ্ধই আছে। জগৎগত যে সকল বস্তু আছে তাহাদের নিজস্ব প্রভেদবশতঃ তাহাদের পরস্পরের মধ্যে যে প্রভেদ জন্মায় তাহা প্রসিদ্ধই। বস্তুরা যেমন যেমন অবস্থায় ছিল সেই সেই অবস্থায় অবস্থিত থাকিলেও স্বভাবভেদের জন্য কাব্যার্থের অনন্ততা আসে।

এই বিষয়ে কেহ কেহ হয়ত বলিবেন—বস্তুসমূহ যে বাচ্যার্থের বিষয়ীভূত হয় তাহা তাহাদের সাধারণ রূপের দ্বারা, কোন বিশেষ রূপের দ্বারা নহে। কবিরা নিজেরা সুখাদি অনুভব করেন; তাহাদের নিমিত্ত-স্বরূপ যে সকল পদার্থ আছে তাহাদিগকে অন্যত্র আরোপ করিয়া স্বীয় পরের অনুভূতির মধ্যে যে সর্ব্বসাধারণত্ব আছে তাহাই রচনা করেন। যোগীদের ন্যায় তাঁহারা অতীত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান এবং পরিচিত বস্তু প্রভৃতির স্বরূপ প্রত্যক্ষ করেন না। পরকে যাহা অনুভব করান যায় এবং নিজে যাহা অনুভব করা হয় ইহাদের যে সাধারণ রূপ, যাহা সকল প্রতিপত্তার বিষয়ীভূত তাহা পরিমিত বলিয়া পুরাতন কবিদের গোচর হইয়াই আছে; সেই সাধারণ বস্তুকে বিষয়-বহির্ভূত বলিলে অসঙ্গত হইবে। সুতরাং সেই প্রকারবিশেষকে যে আধুনিক কবিরা নূতন বলিয়া মনে করেন ইহা তাঁহাদের

নিজেদের একটা [ ভ্রমাত্মক ] বিশ্বাসমাত্র। ইহার মধ্যে উক্তির বৈচিত্র্যমাত্র আছে।

উত্তরে এই প্রসঙ্গে বলা হইতেছে—যদি বস্তুর সাধারণ ধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়াই কবির কাব্যপ্রবৃত্তি হয় তাহা হইলে কাব্যপ্রকারের অবস্থাদি-বৈশিষ্ট্যমূলক যে বৈচিত্র্য দেখান হইয়াছে তন্মধ্যে কি পুনরুক্তি হইবে? যদি সেই পুনরুক্তি নাই হয় তবে কেন কাব্যের অনন্ততা হইবে না? বস্তুর সাধারণ রূপমাত্রকে আশ্রয় করিয়া যে কাব্য প্রবৃত্ত হয় তাহা পরিমিত বলিয়া পূর্ব্বেই কবিদের গোচরীভূত হইয়াছে। সুতরাং তাহার নূতনত্ব নাই—এই যে মত প্রকাশিত হইয়াছে তাহা অযুক্ত। যদি সাধারণ ধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়াই কাব্য প্রবর্ত্তিত হয় তাহা হইলে মহাকবিবিরচিত কাব্যার্থের আতিশয্য কিসের দ্বারা কৃত হয়?

কিন্তু বাল্মীকিব্যতিরিক্ত অন্য লোককেও কবি বলা হইয়া থাকে। (যদি পূর্ব্বপক্ষীয় যুক্তি মানিয়া লওয়া হয় তাহা হইলে) সর্ব্বসাধারণ-প্রযোজ্য অর্থ ছাড়া অন্য কোন কাব্যার্থ থাকে না এবং সর্ব্বসাধারণ-প্রযোজ্য অর্থ তো আদিকবিই দেখাইয়া দিয়াছেন। যদি বলা হয় উক্তির বৈচিত্র্যবশতঃ ইহাতে কোন দোষ হয় না তাহা হইলে বলিব, এই উক্তি-বৈচিত্র্য জিনিষটি কি? উক্তি হইতেছে সেই বচন যাহার দ্বারা বাচ্য অর্থবিশেষ প্রতিপাদিত হয়। তাহার যদি বৈচিত্র্য থাকে, তবে বাচ্য অর্থের কেন বৈচিত্র্য থাকিবে না, কারণ বাচ্য ও বাচক অবিনাভূত হইয়া থাকে? কাব্যে যে বাচ্য অর্থ প্রতিভাসিত হয় তাহার রূপ প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের দ্বারা গ্রাহ্য বস্তুবিশেষের সঙ্গে অভিন্ন বলিয়া প্রতীত হয়। সুতরাং যিনি উক্তির বৈচিত্র্য সম্পর্কিত মত পোষণ করেন তিনি ইচ্ছা না করিলেও বাচ্য অর্থের বৈচিত্র্য স্বীকার করিতে বাধ্য হইবেন। তাই এই সংক্ষিপ্ত মত বলা হইতেছে—

"বাল্মীকিব্যতিরিক্ত কোন একটি কবির রচিত অর্থে যদি প্রতিভা

মানিয়া লওয়া যায় তাহা হইলে তাহার অনন্ততা অক্ষয় হইয়া পড়ে।”

অপিচ, উক্তির বৈচিত্র্যকে যদি কাব্যের নবীনতার কারণ মনে করা যায় তাহা হইলে তাহা আমাদের পক্ষে অনুকূলই হয়। কারণ কাব্যার্থের অনন্ত ভেদের হেতু এই যে প্রকার পূর্ব্বে দর্শিত হইয়াছে তাহা পুনরুক্তির বৈচিত্র্যবশতঃ দ্বিগুণ হয়। এই যে উপমাশ্লেষাদি অলঙ্কারবর্গ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে তাহা ভণিতিবৈচিত্র্যের সহিত রচিত হইলে নিজেই শত শাখা লাভ করে। যাহাকে ভণিতি বা উক্তি বলা হয় তাহাও নিজ ভাষাভেদের দ্বারা ব্যবস্থাপিত হইলে প্রত্যেক ভাষার নিয়মানুসারে যে অর্থ তাহার গোচরীভূত হয় তাহার বৈচিত্র্য-হেতু কাব্যার্থে অন্য রকমের বৈচিত্র্যের সৃষ্টি হয়। যেমন আমারই রচিত নিম্নলিখিত শ্লোকে—

“ ‘আমার’, ‘আমার’ বলিতে বলিতে মানুষের কাল চলিয়া যায়। তথাপি দেব জনার্দ্দন মনের গোচর হয়েন না।” [ মধুসূদন আমারই, আমারই ]

এইভাবে যেমন যেমন নিরূপিত হয় তেমন তেমন ভাবে কাব্যার্থ অনন্ততা লাভ করে। ইহা কিন্তু বলা হইতেছে—

**অবস্থাদির দ্বারা বিভিন্নতা প্রাপ্ত বাচ্য অর্থের যে রচনা**

যাহা পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে—

**তাহা উদাহরণীয় কাব্যে প্রচুর পরিমাণে দেখা যায় ;**

তাহা পৃথক্ করা যায় না—

**বরং তাহা রসাশ্রয়ে দীপ্তি প্রাপ্ত হয়। ৮ ॥**

তাই সৎকবিদের উপদেশের নিমিত্ত ইহা সংক্ষেপে বলা হইতেছে—

**দেশকালাদির ভেদে বৈশিষ্ট্যপ্রাপ্ত বস্তুজগৎ যদি রসভাবাদির সঙ্গে সম্পৃক্ত হইয়া ঔচিত্যানুসারে অন্বিত হয়। ৯ ॥**

তবে পরিমিতশক্তিসম্পন্ন, বাল্মীকিব্যতিরিক্ত অন্য কবিদের গণনা কি ভাবে করা যাইবে—

**জগতের প্রকৃতির মত তাহা সহস্র বাচস্পতির দ্বারা রচিত হইলেও ক্ষীণতা প্রাপ্ত হয় না। ১০ ॥**

যেমন অতীত কল্পপরম্পরায় বিচিত্র বস্তুপ্রপঞ্চকের আবির্ভাব হইলেও ইহা বলা যায় না যে এখন জগৎ প্রকৃতির অন্য পদার্থ নির্ম্মাণশক্তি ক্ষীণ হইয়া গিয়াছে সেইরূপ কাব্যের অর্থপরম্পরাযুক্ত মর্য্যাদা অনন্ত কবিপ্রতিভার দ্বারা আহৃত হইলেও তাহা এখনও ক্ষয় পাইতেছে না বরং নব নব ব্যুৎপত্তিসম্পন্ন কবিপ্রতিভার দ্বারা পরিপুষ্ট হইয়া তাহা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে। এইরূপ হইলেও—

**সুমেধাসম্পন্ন কবিদের মধ্যে সাদৃশ্য (সংবাদ) বহুল পরিমাণেই থাকে।**

ইহা নিশ্চিতরূপে দেখা যায় যে মেধাবীদের বুদ্ধির মধ্যে সাদৃশ্য থাকে। কিন্তু—

**সেই সকল পণ্ডিতগণের মধ্যে যে সাদৃশ্য তাহা অবিকল একাকার নহে। ১১ ॥**

যদি প্রশ্ন করা হয় কেন—

**অন্য কাব্যার্থের সহিত সাদৃশ্যকে সংবাদ বা সম্মতি বলে। সেই সাদৃশ্য আবার তিন প্রকারের হইতে পারে—দেহীদের সঙ্গে প্রতিবিম্বের যেরূপ সাদৃশ্য থাকে সেইরূপ, অথবা দেহীদের সঙ্গে আলেখ্যের যেরূপ সাদৃশ্য থাকে সেইরূপ, অথবা এক দেহীর তুল্য অন্য শরীরীর যে সাদৃশ্য থাকে, সেইরূপ। ১২ ॥**

অন্য কাব্যবস্তুর সহিত যে সাদৃশ্য তাহাকেই সংবাদ বলে। তাহা আবার তিন প্রকারের—শরীরীদের প্রতিবিম্বের সহিত, আলেখ্যের

সহিত বা তুল্য দেহীর সহিত। এমন কোন কোন কাব্যবস্তু আছে যাহা অন্য বস্তুর হুবহু নকল করিয়া সাদৃশ্য লাভ করে, এই সাদৃশ্য প্রতিবিম্ববৎ। আবার কোন কোন কাব্যবস্তু আছে যাহার সঙ্গে অন্য কাব্যবস্তুর সাদৃশ্য আলেখ্যের সহিত সাদৃশ্যের ন্যায়। আর এক প্রকারের কাব্যবস্তু আছে যাহার সঙ্গে অন্য কাব্যবস্তুর সাদৃশ্য তুল্য শরীরীর সঙ্গে সাদৃশ্যের ন্যায়।

**এই সকল সাদৃশ্যের মধ্যে প্রথমটির মূল হইতে বিভিন্ন অন্য আত্মাশূন্য, দ্বিতীয় সাদৃশ্যের মধ্যে যে আত্মা আছে তাহা তুচ্ছ—কবি ইহাদিগকে পরিহার করিবেন। তৃতীয় যে সাদৃশ্য আছে তাহা প্রসিদ্ধ আত্মাবিশিষ্ট; তাহা কবি পরিহার করিবেন না। ১৩॥**

তন্মধ্যে প্রথম প্রতিবিম্বকল্প কাব্যবস্তু সুমতিসম্পন্ন কবি পরিহার করিবেন; যেহেতু তাহা পূর্ব্ব আত্মা হইতে বিভিন্ন অন্য তাত্ত্বিক আত্মাসম্প নহে। অপর যে দ্বিতীয় আলেখ্যবৎ সাদৃশ্য আছে তাহাও পরিত্যাজ্য, কারণ তাহার মধ্যে যে আত্মা আছে অন্য শরীরে তাহা যুক্ত হইলেও তাহা তুচ্ছ। তৃতীয় যে প্রকার তাহাতে কমনীয়তাবিশিষ্ট শরীর থাকিলে সেই কাব্যবস্তু সাদৃশ্যময় হইলেও কবি তাহা পরিহার করিবেন না। একই দেহী অপরের সঙ্গে সাদৃশ্যযুক্ত হইলেও তাহারা এক এমন বলা যায় না।

ইহা বুঝাইবার জন্য বলা হইতেছে—

**পৃথক্ আত্মার অস্তিত্ব থাকিলে, কোন বস্তু পূর্ব্ব তত্ত্বানুযায়ী হইলেও অধিকতর ঔজ্জ্বল্য লাভ করে, যেমন তন্বীর মুখ চন্দ্রতুল্য হইলেও অধিকতর দীপ্তি পায়। ১৪॥**

বাচ্যাতিরিক্ত অন্য সারভূত তত্ত্বরূপ আত্মা থাকিলে কাব্যবস্তু পূর্ব্ব-কবিদের বর্ণিত বিষয়ের অনুযায়ী হইলেও অধিকতর ঔজ্জ্বল্য লাভ

করে। পুরাতন রমণীয় কান্তির দ্বারা অনুগৃহীত বস্ত্র শরীরের ন্যায় পরম শোভার পোষকতা করে। তাহার মধ্যে পুনরুক্তি দোষ প্রকাশিত হয় না। ইহার সঙ্গে তুলনা করা যাইতে পারে চন্দ্রের শোভাবিশিষ্ট তন্বীর মুখের।

এইভাবে সমগ্ররূপবিশিষ্ট, সাদৃশ্যযুক্ত বাক্যার্থের সীমা বিভাগ করা হইল। অন্যবস্তুর সঙ্গে সাদৃশ্যসম্পন্ন পদার্থ এবং সেইজাতীয় কাব্যবস্তুতে কোন দোষ নাই, ইহা প্রতিপাদন করিবার জন্য বলা হইতেছে—

**নূতন কাব্যবস্তু স্ফুরিত হইলে প্রাচীন কবিপরম্পরানিবদ্ধ কাব্যবস্তুর রচনা অক্ষরাদি রচনার ন্যায়ই দোষাবহ হয় না। ১৫॥**

বাচস্পতিও অপূর্ব্ব কোন অক্ষর বা পদ ঘটাইতে সমর্থ হয়েন না। কাব্যাদিতে সেই সকল পুরাতন অক্ষর বা পদ নিবদ্ধ হইলে তাহারা কাব্যের নূতনত্বের বিরোধী হয় না। সেইরূপ শ্লেষাদিময় অর্থতত্ত্বসম্পন্ন অপূর্ব্ব পদার্থও কেহ ঘটাইতে পারে না।

সুতরাং—

**যে কোন বস্তুই হউক তাহা যদি লোকের নিকট স্ফুরিত হয় সেইখানে এই চমৎকৃতি উৎপন্ন হয়।**

এই স্ফুরণা কি? সহৃদয় ব্যক্তিদের চমৎকৃতি। ইহা উৎপন্ন হয়।

**সেইরূপ কাব্যবস্তু পূর্ব্বতন কাব্যের শোভার অনুজ্ঞাদায়ী হইলেও সুকবি তাহা রচনা করিলে তাহা নিন্দার্হ হয় না। ১৬॥**

সেইরূপ বস্তু পূর্ব্বতন কাব্যের শোভার অনুগত হইলেও সুকবি যদি তাঁহার অভিপ্রেত ব্যঙ্গ্য অর্থ প্রকাশ করিতে সমর্থ অর্থ ও শব্দ রচনারূপ শোভা চয়ন করিয়া সেই কাব্যবস্তু সৃষ্টি করেন তাহা হইলে তিনি নিন্দনীয় হয়েন না। সুতরাং ইহা স্থির হইল—

"কবিকর্তৃক সুষ্ঠুরূপে প্রকটিত, বিবিধ অর্থসমন্বিত, অমৃতরসযুক্ত বাণী বিস্তার লাভ করুক্। স্বীয় অনবদ্য বিষয়ে কবিরা যেন অবসাদগ্রস্ত না হয়েন।"

"কাব্যার্থসমূহ অভিনব; অপর কবি কর্ত্তৃক রচিত অর্থ সৃষ্টি করায় কোন গুণ নাই।"—ইহা চিন্তা করিয়া [তাঁহারা অবসাদগ্রস্ত হইবেন না।]

**যে সুকবি পরস্ব গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক তাঁহার এই ঐশ্বর্য্যশালিনী বাণী যথেষ্ট কাব্যবস্তু সৃজন করিয়া দেয়। ১৭॥**

পরস্বগ্রহণে বিরতমনা সুকবির এই ঐশ্বর্য্যশালিনী বাণী যথাভিলষিত বস্তু ঘটাইতে থাকে। যে সকল সুকবি পুণ্যাভ্যাস বলে কাব্যব্যাপারে প্রবৃত্ত হয়েন এবং যাঁহারা অপরের রচিত অর্থগ্রহণে নিঃস্পৃহ তাঁহাদের নিজস্ব চেষ্টার কোন উপযোগিতা থাকে না; সেই ঐশ্বর্য্যশালিনী বাণী স্বয়ং অভিপ্রেত অর্থের আবির্ভাব করায়। ইহাই মহাকবিদের মহাকবিত্ব। ইতি ওঁ। অধিক বলা বাহুল্য।

যে উদ্যান অম্লান রসের আশ্রয়, যাহা সমুচিত গুণ ও অলঙ্কারাদির শোভায় সমন্বিত, যাহা হইতে সুকৃতিশালী ব্যক্তিরা সকল অভিলষিত বস্তু লাভ করেন, সেই কাব্যনামক নিখিল সৌখ্যের ধামস্বরূপ পণ্ডিতদের কল্লোদ্যানে আমি ধ্বনিমার্গ দেখাইয়াছি। এই সেই ধ্বনি যাহার মহিমা কল্পতরুর তুল্য; তাহা ভাগ্যবান্ সহৃদয় ব্যক্তিদের কাছে আস্বাদযোগ্য হইয়া থাকুক।

সৎকাব্যতত্ত্বের ন্যায্য পথ যাহা পরিপক্কবুদ্ধি গ্রন্থকারদের মনে প্রসুপ্ত অবস্থায় ছিল প্রথিতনামা আনন্দবর্দ্ধন সহৃদয় ব্যক্তিদের অভ্যুদয়ের জন্য তাহা প্রকাশ করিলেন।

ইতি শ্রীরাজানক আনন্দবর্দ্ধনাচার্য্য কর্ত্তৃক বিরচিত ধ্বন্যালোকে চতুর্থ উদ্দ্যোত।